মহা নাবীর সর্ব শেষ ওসিয়ত
আস-সালাত, আস-সালাত

[বাংলা]

الصلاة، الصلاة

[هي آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم:]

[اللغة البنغالية]

লেখক : নূর মুহাম্মদ বদীউর রহমান

تأليف : نور محمد بديع الرحمن

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

মহা নাবীর সর্ব শেষ ওসিয়ত
আস-সালাত, আস-সালাত

(الصلاة، الصلاة)

[هي آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم:]

ভূমিকা

حمدالله وصلاة وسلاماعلى سيدنا محمد بن عبد الله................

হামদ ও সালাতের পর।

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে কালেমার পরই সালাতের স্থান। কালেমার পর এটি সর্বোত্তম আমল। ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত স্তম্ভ এটি। সুতরাং সালাত ব্যতীত মুসলমানের ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। কেননা সালাত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন। এটি শারীরিক ইবাদাতের মূল। সালাতই সকল উম্মাতের দীন। আসমানী শরীয়াতের কোনটিই সালাতমুক্ত ছিল না। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে এটি ফরজে আঈন। আল্লাহ তা'আলা মিরাজ রজনীতে আসমানে সালাত ফরজ করেছেন। অন্যান্য ইবাদাত এমনটি নয়। অতএব সালাতের মর্যাদা সহজেই অনুমেয়। এটি সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ। কোন অবস্থায়ই এটি ছাড়া যাবে না। অন্যান্য রোকনগুলোর ব্যাপারে অবশ্য কিছুটা সহজ করা হয়েছে।[১]

নিশ্চয় সালাতের রয়েছে বিশেষ এক মর্যাদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন। মহান আল্লাহ যা কিছু বান্দার উপর ফরজ করেছেন তার মধ্যে সালাত সবচে' বড়। কেননা অন্য সকল ইবাদাত ফরজ হয়েছে করা হয়েছে যমীনে। আর সালাত ফরজ হয়েছে সুউচ্চ স্থান সিদরাতুল মুনতাহাতে, যেখানে ইতিপূর্বে সৃষ্টির কেউ পৌছতে পারেনি।

পবিত্র কুরআনে সালাত শব্দটি ৬৬ বার এসেছে। আর এ ধাতু থেকে নির্গত শব্দসমূহ এসেছে ৩৩ বার। সর্বমোট ৯৯ বার। এছাড়া সালাতের সমার্থবোধক ও তার প্রতি ইঙ্গিতসূচক শব্দও এসেছে বহুবার। যেমন-'রুকূকারী', 'সিজদাকারী', 'আল্লাহর জন্য সিজদা করে' ইত্যাদি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমি যেমন সালাতের ফযীলত বর্ণনা করেছি, তেমনি উল্লেখ করেছি সালাত ত্যাগ করা কিংবা অবহেলা করার পরিণতিও। যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে অনেক হাদীসে। সেসব হাদীস আমি

[১] : ঋতুবতী নারী ও পাগল ব্যক্তি অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

বরাতসহ উদ্বৃত করার চেষ্টা করেছি এ বইটিতে। আর সবই করেছি সালাতের মর্যাদা বর্ণনা করা ও তা আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে।

আমার এ বই থেকে কেউ যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তার প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল, তিনি যেন এ গুনাহগার ও তার পিতা-মাতা, উস্তাদবর্গ এবং সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করেন।

ইসলামে সালাতের মর্যাদা:

সালাত একটি আদি ইবাদাত যা সকল ধর্মেই ছিল। সালাত ঈমানের দাবি। কোন শরিয়তই সালাত থেকে খালি ছিল না। কারণ যে ধর্মে সালাত নেই তা পূর্ণ কল্যাণবাহী হতে পারে না। কিতাব ও সুন্নাহ্তে সালাতের আদেশ করা হয়েছে। ইসলাম সালাতের বিষয়টি কঠিনভাবে নিয়েছে। আর সালাত তরককারীদের সতর্ক করেছে বারবার। কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হিসাব নেয়া হবে সালাতের। এ কারণেই সকল নবী-রাসূল সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম আ.-এর দু'আতে সালাতের বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿إبراهيم:٤٠﴾

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার পরিবারকেও"।[১]

আর সালাতের কারণে ইসমাঈল আ.-এর প্রশংসা করছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿مريم:٥٥﴾

"আর সে তার পরিবারকে সালাত ও যাকাতের আদেশ করত এবং সে ছিল তার রবের নিকট সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত"।[২]

আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিলের প্রথমভাগেই মূসা আ.- কে সালাত কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন।

[১] সূরা ইবরাহীম: ৫৫

[২] সূরা মারইয়াম: ৫৫

ইরশাদ হয়েছে-

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿طه:١٣-١٤﴾

"আর আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি অতএব তুমি ভালভাবে ওহী শ্রবণ কর। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর"।[১]

ফেরেশতাগণ ঈসা আ.-এর মাতা মরিয়মকে ডেকে এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿آل عمران:٤٣﴾

"হে মরিয়ম, তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সিজদা ও রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে"।[২] ঈসা আ. স্বীয় রবের নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿مريم:٣١﴾

"আর তিনি আমাকে বরকতপূর্ণ বানিয়েছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন এবং আমাকে অসিয়ত করেছেন সালাত ও যাকাতের- আমি যতদিন জীবিত থাকি"।[৩]

লোকমান আ. তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেন-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿لقمان:١٧﴾

"হে বৎস, সালাত কায়েম কর। সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর আগত মুসিবতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্ভুক্ত"।[৪]

---

[১] সূরা ত্বহা: ১৪
[২] সূরা আলে ইমরান : ৪৩
[৩] সূরা মারইয়াম : ৩১
[৪] সূরা লোকমান: ১৭

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং সালাতকে অঙ্গীকারকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে সবচে' গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿البقرة:٨٣﴾

"আর আমি যখন বনী ইসরাঈলের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না। পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। আর মানুষকে ভাল কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে"।[১]

আল্লাহ তা'আলা এই সালাত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন তদীয় আখেরী নবীকেও-

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴿العنكبوت:٤٥﴾

"যে কিতাব আপনার উপর ওহী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে আপনি তা তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন"।[২]

আর আল্লাহ তা'আলা একে মুমিনের জন্য অপরিহার্য গুণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের পর। ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴿البقرة:٣﴾

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সালাত কায়েম করেছে"।[৩] সফল মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সালাত দ্বারা শুরু করে সালাত দ্বারাই শেষ করেছেন। ইরশাদ করেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿المؤمنون:١-٢﴾

"ওই সকল মুমিন সফল যারা তাদের সালাতে বিনম্র থাকে.... "[৪]

---

[১] সূরা বাকারা: ৮৬
[২] সূরা আনকাবুত : ৪৮
[৩] সূরা বাকারা : ৩১
[৪] সূরা মুমিনূন : ১-২

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿المؤمنون:٩﴾

"যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে" ।[১]

সফরে-বাড়িতে, নিরাপদে-ভয়ে, শান্তিতে-যুদ্ধে–সর্বাবস্থায়ই এর প্রতি যত্নবান হওয়ার তাকিদ এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে ঈমানের উপর চলার প্রথম প্রমাণ এবং কাফির-মুসলিম পৃথক করার বা (চেনার) উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-

إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

"ব্যক্তির মাঝে ও শিরক- কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয় হল সালাত ত্যাগ করা" ।[২] বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.

"আমাদের আর তাদের মাঝে মূল অঙ্গীকার হল সালাত, যে ব্যক্তি তা তরক করল সে কুফরী করল" ।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله و ماله.

"যে ব্যক্তির সালাত ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ যেন কেড়ে নেয়া হল" ।[৪]

এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে গেলে যদি এই হয় তাহলে যে ব্যক্তি মোটেও সালাত আদায় করে না তার ব্যাপারে কী রকম ফয়সালা হবে?

সালাত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর উপরে উল্লিখিত সতর্কবাণী ও কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করে ইমামদের একটি দল নিম্নোক্ত অভিমত পোষণ করা আশ্চর্যের কিছু নয়। সালাত ত্যাগকারী কাফির এবং দ্বীন থেকে বহিস্কৃত। অপর একদল

[১] সূরা মুমিনূন : ৯
[২] মুসলিম
[৩] আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
[৪] আহমদ, ইবনে হিব্বান

আলেম বিষয়টি একটু হালকাভাবে দেখেছেন। তাদের মতে, সালাত ত্যাগকারী ফাসেক। তার ঈমান হারানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামে সালাতের মর্যাদা এমনটিই। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপর ফরয হয়। সরকার যেমনিভাবে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যথেষ্ট মনে না করে রাষ্ট্রদূতদের সরাসরি ডেকে পাঠিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, ঠিক তেমনিভাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পরে আগত সকল মানুষের জন্য দূত। আল্লাহ তা'আলা সালাতের পয়গাম দেয়ার জন্য তাঁকে আসমানের উপর ডেকে পাঠালেন। অতএব আল্লাহর নিকট সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়।

সালাত যেমন হওয়া উচিৎ :

ইসলাম যে সালাত চায় তা শুধু কতগুলো বাক্য নয়, যা মুখে মুখে আওড়ানো হয় কিংবা শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ারও নাম নয় যাতে মস্তিষ্কের ভাবনা নেই এবং অন্ত রের একাগ্রতা নেই। যে সালাতে মোরগের মত ঠোকর মারা হয়, কাকের মত ছোঁ মারা হয় কিংবা শিয়ালের মত এদিক সেদিক তাকানো হয়। না কখনো এ সালাত শরিয়তে কাম্য নয়। বরং শুধু এমন সালাতই গ্রহণযোগ্য যাতে চিন্তা-ফিকির, বিনম্রতা-একাগ্রতা এবং মাবুদের মাহাত্ম্যের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।

আর প্রকৃত পক্ষে সালাতের বরং সকল ইবাদতের প্রধান উদ্দেশ্য হল বান্দাকে মহান রাব্বুল আলামীনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿طه:١٤﴾

"আর তুমি আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর" ।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সালাত ফরজ হওয়া ও হজের কার্যাদি পালনের আদেশ একমাত্র আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের রূহের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: 'সালাত হল বিনম্রতা, একাগ্রতা ও কাকুতি-মিনতি করা এবং দু'হাত তুলে

[১] সূরা ত্বহা: ১৪

‘আল্লাহ আল্লাহ’ বলার নাম। যার সালাত এমন নয় সেটা ধোঁকা অর্থাৎ অসম্পূর্ণ।[১]

সালাতে অন্তর স্থির রাখার জন্য এটি একটি সতর্কবাণী। আর অন্তর স্থির রাখা বলতে কী বুঝায় তা জানার জন্য আল্লাহর এ বাণীই যথেষ্ট-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿النساء:٤٣﴾

“হে মুমিনগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা কী বল তা বুঝতে পার”।[২]

এ আয়াতে বিবেক–বুদ্ধি সজাগ রাখার ব্যাপারে সর্তক করা হয়েছে। এমন অনেক মুসল্লী রয়েছে যারা সালাতে কী বলছে তাও জানতে পারে না অথচ তারা মদপান করেনি। মূলত অজ্ঞতা, গাফলতি, দুনিয়ার ভালবাসা ও প্রবৃত্তির অনুসরণই তাদেরকে মাতাল করে দিয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, জিকির ও ফিকিরের সাথে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করা অন্যমনস্ক হয়ে পূর্ণ রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

এ সালাতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুশীতল করত। এর জন্যই তাঁর অন্তর কাঁদত এবং এর দ্বারাই তাঁর অন্তর প্রশান্তি লাভ করত। বিলাল রা. বলতেন, আমাদের এর দ্বারা অর্থাৎ সালাতের দ্বারা শান্তি দাও। এটিই হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালবাসার সালাত। অধিকাংশ মানুষ যেভাবে মোরগের ঠোকর মারা ও কাকের ছোঁ মারার মত সালাত আদায় করে তা এমনটি নয়। যারা বলে, “আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে শান্তি দাও” তাদের ও ওদের মাঝে কতইনা ব্যবধান![৩]

সালাত রহমানের পক্ষ থেকে বিশেষ হিফাযত :

যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে একাগ্রতার সাথে জামাআতে সালাত আদায় করে আল্লাহ তা‘আলা সেদিন তার হিফাযত করবেন, যেদিন অন্যান্য মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে।

[১] তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ

[২] সূরা নিসা : ৪৩

[৩] ড. ইউসুফ আল–কারযাবী, আল–‘ইবাদাতু ফিল ইসলাম, পৃ. ২১২-২১৪

উমর রা. অন্তিম শয্যায় শায়িত। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন, তোমরা সালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যে ব্যক্তি সালাত তরক করে ইসলামে তার কোন অংশ নেই।[১]

যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে, আল্লাহ তাকে হিফাযত করবেন। আর যে ব্যক্তি সালাত নষ্ট করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিদান কর্ম অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿البقرة:٤٠﴾

“তোমরা আমার সাথে-কৃত ওয়াদা পূর্ণ কর, আমি তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করব”।[২] আর এ এখানে সংরক্ষণ সালাত ও মুসল্লীর মাঝে পরস্পরে হয়ে থাকে। যেমন যেন বলা হয়েছে, তুমি সালাতের হিফাযত কর যাতে সালাত তোমাকে হিফাযত করে। তবে সালাত কর্তৃক মুসল্লীর হিফাযত কয়েকভাবে হয়ে থাকে। যথা-

১. গুনাহ থেকে হিফাযত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿العنكبوت:٤٥﴾

“নিশ্চয় সালাত অশালীন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যে সালাতের হিফাযত করবে সালাত তাকে অশালীন কাজ থেকে হিফাযত করবে”।[৩]

২. বালা–মুসীবত থেকে হিফাযত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴿البقرة:١٥٣﴾

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও”।[৪]

৩. কবরে ও কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাযত। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

“যে ব্যক্তি এসবের (সালাতের) হিফাযত করবে কিয়ামত দিবসে এসব তার জন্য নূর, প্রমাণ ও নাজাতের কারণ হবে”।[১] এছাড়া সালাতের চাবি তথা পবিত্রতা

[১] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা

[২] সূরা বাকারা: ৫৫

[৩] সূরা আনকাবুত : ৪৫

[৪] সূরা বাকারা : ১৫৩

সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ''কেবল মুমিন ব্যক্তিই ওযুর হিফাযত করে'' ।

৪. মুসল্লী আল্লাহর হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। যেমন- জুনদুব ইবনে সুফিয়ান রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে"। অতএব আল্লাহর হিফাযতের মধ্যে কেউ যেন সে ব্যক্তির পিছনে না পড়ে।[২]

এ হাদীসে সে ব্যক্তিকে কঠিন হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে যে ফজরের নামাযে উপস্থিত মুমিনকে কষ্ট দেয়। কেননা সে আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে আগত ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করতে চেয়েছে। আর আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে হিফাযত করাটা দুইভাবে হতে পারে:

এক. দুনিয়াবী ব্যাপারে তাকে হিফাযত করা। যেমন- দেহ সুস্থ রাখা; সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ রক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿الرعد:١١﴾

"তার সামনে ও পিছনে আছে পরপর আগমনকারী ফেরেশতাগণ যারা তাকে আল্লাহর নির্দেশে রক্ষা করেন"[৩]। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তারা হলেন ফেরেশতা যারা তাকে আল্লাহর হুকুমে হিফাযত করেন। অতঃপর যখন তাকদির চলে আসে, তখন তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজ করার কারণে বান্দার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের যান মালের হেফাযত করেন। যেমনিভাবে ইরশাদ হয়েছে :

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴿الكهف:٨٢﴾

আর তাদের পিতামাতা ছিল নেককার। তাদের পিতা-মাতার নেককার হওয়ার কারণে তাদেরকে হিফাযত করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব র. তার ছেলেকে বলেন, আমি তোমার জন্য আমার সালাত বাড়িয়ে দেই; তোমার হেফাযতের আশায়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন-

---

[১] মুসনাদে আহমদ
[২] মুসলিম পৃ: ৬০৭, কিতাবুল মাসাজিদ।
[৩] সূরা রা'দ : ১১

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴿الكهف:٨٢﴾

"আর তাদের পিতা-মাতা নেককার ছিল"[১]। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. বলেন, আল্লাহ মুমিন বান্দাকে তার সন্তান ও বংশের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখেন।[২]

দ্বিতীয় প্রকার হিফাযত হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দীন ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। তিনি তাকে সকল প্রকার সন্দেহ ও গোমরাহী থেকে হিফাযত করেন। তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেন। মৃত্যুর সময় তার ঈমান নসীব করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন,

হে আল্লাহ, তুমি যদি আমার রূহ আটকিয়ে রাখ, তাহলে তার উপর তুমি রহম কর, আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি তোমার খাস বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাযত কর, তেমনিভাবে তা হিফাযত কর।[৩]

মসজিদের জামাআত থেকে দূরে থাকার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق هي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.

ইশা ও ফজরের সালাত মুনাফিকদের নিকট বেশি ভারী বলে মনে হয়। তারা যদি ইশা ও ফজরে কি ফযীলত নিহিত আছে তা জানত, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দু'টি সালাতে শামিল হত। আমার ইচ্ছে হয় আমি সালাতের নির্দেশ দেই অতঃপর জামাআত শুরু করা হোক। আর এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেই লোকদের সালাত পড়াবার। অতঃপর যাদের কাছে জ্বালানি কাঠ আছে ওদের সাথে ওই

---

[১] সূরা কাহফ : ৮২
[২] তাফসীর মাওয়ারদী
[৩] বুখারী, মুসলিম ১ম খন্ড : ৬৫৭

সকল লোকের নিকট গিয়ে তাদের ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেই যারা সালাতে হাজির হয় না ।

ইবনে উম্মে মাকতুম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিবেদন করলাম, 'আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ । আমার বাসস্থানও একটু দূরে । উপরন্তু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কেউ নেই । এমতাবস্থায় আপনি কী আমাকে জামাআত ত্যাগ করার অনুমতি দিবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি আযান শুনতে পাও? বললাম, জি হ্যাঁ । তিনি বললেন, তোমাকে আমি অনুমতি দেয়ার কোন পথ দেখছি না ।

ইবনে আব্বাস রা. কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত্র নফল সালাত পড়ে, কিন্তু জুমু'আ ও জামাআতে হাজির হয় না । তার সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, লোকটি জাহান্নামী ।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে যখন জানা গেল যে, যারা ঘরে সালাত পড়ে; মসজিদে হাজির হয় না তাদের ব্যাপারে হুমকি ও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । এরূপ সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঘরে সালাত পড়ে সে অসুস্থ হৃদয় ও অশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী । আর মসজিদের জামাআত ত্যাগ করা মুনাফেকির লক্ষণ । পথ-ভ্রষ্টতার নিদর্শন । যেমন এক রেওয়ায়াতে এসেছে- একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিকই জামাআতে সালাত ত্যাগ করে । বাস্তব কথা হল, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এর বাস্তব অর্থ বুঝেছেন । এ কারণেই তাদের প্রত্যেকেই অসুস্থতা সত্ত্বেও মসজিদে যেতেন । মসজিদে নিয়ে যাবার ব্যাপারে অন্যের সহায়তা চাইতেন । হাফেজ আবুবকর ইবনে মুনজেরী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আযান শুনল অতঃপর ওজর ছাড়া উত্তর দিল না, তার সালাতই হবে না । তাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ ও আবু মূসা আশআরী রা.-ও রয়েছেন । আর যাদের মতে, জামাআতে হাজির হওয়া ফরজ তারা হলেন- আতা, আহমদ ইবনে হাম্বল ও আবু সাওর র. । শাফেয়ী রহ. বলেন, ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি জামাআতে সালাত পড়ার শক্তি রাখে আমি তাকে জামাআত ত্যাগ করার অনুমতি দেই না । আওযায়ী রহ. বলেন, জুমু'আ ও জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে কোন পিতা-মাতার আনুগত্য চলবে না । এসবের প্রমাণ, ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ মুসলিমে আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে যা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের

দিন মুসলমানরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন সালাত সমূহ এমন স্থানে আদায় করার এহতেমাম করে যেখানে আযান হয় । কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য এমনসব সুন্নত জারি করেছেন যেগুলো সম্পূর্ণ হিদায়াত । আর ওই সকল সুন্নাতের মধ্যে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করাও রয়েছে । যদি তোমরা অমুক ব্যক্তির ন্যায় ঘরে সালাত আদায় করে নাও তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ করবে, আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর তবে অবশ্যই তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকত না । এমন কি যে ব্যক্তি দুইজনের উপর ভর করেও যেতে পারত তাকেও জামাআতের সাথে কাতারে দাঁড় করে দেওয়া হত ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালতের ফযীলত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿الأعلى:١٤-١٥﴾

"নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতঃপর সালাত আদায় করে" ।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ.
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿المعارج:١٩-٢٣﴾

"নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে । যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে । আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা দেখায় । তবে মুসল্লীরা এমন নয়- যারা তাদের সালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে ।[২]

[১] সূরা : আলা : ১৪-১৫
[২] সূরা মাআরিজ: ১৯-২৩

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারাস্বরূপ, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় ।[1]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, বলতো যদি কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে আর তাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোছল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কোন কিছ অবশিষ্ট থাকবে না । তিনি বললেন, এরকমই পাঁচ ওয়াক্ত সালতের দৃষ্টান্ত যার দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহ সমূহ মুছে দেন ।[1]

আমর ইবনে মুররা আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বলুন তো যদি আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ি, যাকাত আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, রাত্রি জাগরণ করি, তবে আমি কোন দলের অর্ন্তভুক্ত । তিনি বললেন, তুমি সিদ্দীক ও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত ।[2]

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে একটি হাদীস বলব, যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তা তোমাদের বলতাম না । আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে অতঃপর সালাত পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার এ সালাত ও পরবর্তী সালতের মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন ।[3] আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে ওযু করে অতঃপর তার হাতের কব্জি ধৌত করে তখণ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে তার হাত দ্বারা কৃত গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে । যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন পানির প্রথম ফোঁটার সাথে তার চোখ ও মুখ থেকে গুনাহসমূহ ঝরে পরে । যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ও টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করে তখন তার আশপাশের সকল গুনাহ থেকে সে নিরাপদ হয়ে যায়, ফলে সেদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন

[1] বুখারী:৫২৮, মুসলিম:৬৬৭

[2] সহীহ ইবনে হিব্বান ও সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, আলবানী এ হাদীসটিকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন ।

[3] বুখারী, মুসলিম

তার মা তাকে প্রসব করেছে । যখন সে সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করেন[1] ।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট ফযীতলপূর্ণ সালাত জুমু'আর দিন ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করা[2] ।

সালাত সাহায্য, দৃঢ়তা, ইহকাল ও পরকালের সফলতার অন্যতম মাধ্যম :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿المؤمنون:١-٢﴾

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়ী" ।[3]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿الأعلى:١٤-١٥﴾

"নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতঃপর সালাত আদায় করে" ।[4]

সালাতকে কল্যাণ নামকরণ করা হয়েছে । তার প্রতি আহ্বানকে করা হয়েছে কল্যাণের প্রতি আহ্বান । যেমন- حي على الصلاة এসো সালাতের দিকে । حي على الفلاح এসো কল্যাণের দিকে । ফালাহ বলা হয়, উদ্দেশ্যে জয়লাভ করা, কল্যাণ স্থায়ী হওয়া ।

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴿البقرة:١٥٣﴾

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও"[5] ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

[1] আহমদ রহ., আলবানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

[2] আবু নাঈম- হিলইয়াহ, বায়হাকী- শু'আবুল ঈমান, আলবানী র. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

[3] সূরা আল-মুমিনূন: ১

[4] সূরা আলা : ১৫-১৬

[5] সূরা বাকারা : ১৫৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَّ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الأنفال:٤٥﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন দলের সাথে সংঘাতে মিলিত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার" ।[১]

সম্ভবত যুদ্ধের ময়দানে সশস্ত্র অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সালাতুল খাওফের বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যায় ।

সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের সাহায্য করবেন দুর্বলদের দ্বারা । তাদের দাওয়াত, তাদের সালাত ও তাদের ইখলাসের দ্বারা ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ﴿المائدة:١٢﴾

"আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর"[২] ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সাহায্য সহায়তার জন্য যদি তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর । আল্লাহ যার সাথে থাকবেন, তার দায়িত্ব নিবেন । আল্লাহর সাথে যে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন না । যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে লাঞ্ছিত করবেন না । বরং লাঞ্ছনা তার সাথেই থাকবে । যে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাঁর অবাধ্য হবে, আমি তাদেরকে বিজয় দান করলে তারা লোকদের মাঝে সালাত কায়েম করবে আল্লাহর আয়াতই এ কথার সাক্ষ্য দেয় । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهَّ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿الحج:٤١﴾

[১] সূরা আনফাল : ৪৫
[২] সূরা মায়েদা : ১২

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি শক্তি সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এব সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে । প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত" ।[১]

ইমাম খাত্তাবী র. বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, জামাআতে হাজির হওয়া ওয়াজিব । যদি মুস্তাহাব হত তাহলে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্তদের জামাআত ত্যাগ করার সবচে' বেশি অবকাশ থাকত । ইবনে উম্মে মাকতুমের অবস্থাও এরকমই ছিল । কিছু লোকের মত হল জুমু'আ ও দুই ঈদ ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত সালতের জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা । জুমু'আ ও দুই ঈদের জামাআত শর্ত । এটা ওয়াজিবের কাছাকাছি । এমনকি যদি শহরবাসীরা তা তরক করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে । আর যখন একজন তরক করবে তাকে প্রহার ও বন্দি করা হবে । কারো তরক করার অনুমতি নেই । তবে অধিক অন্ধকার ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির ওজরের ভিত্তিতে তা তরক করার অনুমতি রয়েছে ।[২] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরূপ কঠোর বাণী একমাত্র ওয়াজিব তরক করার ক্ষেত্রেই হতে পারে । আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন, শহরে ও গ্রামে কোন মানুষের জন্য আযান শুনে সালাত ত্যাগ করার অনুমতি নেই ।

জামাআতে সালাত পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান :

জামাআত রহমত স্বরূপ । জামাআত ত্যাগ করা শাস্তির কারণ । জামাআতে সালাত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করে । সংযম শিক্ষা দেয় এবং মু'মিনদের পাস্পরিক হারানো অবস্থার প্রশিক্ষণ দেয় । মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর দাসত্বকে একত্র করে । সত্য ও ইখলাসের ফযীলত বৃদ্ধি করে ।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামাআতের সালাত একাকী সালাত থেকে সাতাশ গুন বেশি ফযীলত রাখে ।[৩]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তির ওই সালাত যা জামাআতের সাথে পড়া হয় তা ঘরে বা

[১] সূরা হজ : ৪১
[২] আল-কাসানী
[৩] বুখারী ও মুসলিম

বাজারে একাকী পড়া সালাত হতে পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব রাখে। কেননা কোন ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর মসজিদের দিকে একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করে তখন তার প্রতি কদমে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সালাত পড়ে ওই স্থানে বসে থাকে, যতক্ষণ সে ওযু অবস্থায় বসে থাকে ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন 'হে আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। তার প্রতি রহমত নাযিল কর,। ফেরেশতাদের দু'আর চাইতে কল্যাণকর আর কোন্ আমল হতে পারে?

উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ইশার সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে সে যেন অর্ধরাত্রি সালাত পড়েছে। আর যে ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে সে যেন সারারাত্রি সালাত পড়েছে। আব্দুলাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন : যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলমানরূপে সাক্ষাত করতে চায়, সে যেন এই নামাযসমূহকে এমন স্থানে আদায় করার এহতেমাম করে, যেখানে আযান হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য এমন সব সুন্নত জারী করেছেন, যেগুলি সম্পূর্ণই হিদায়াত। এই সমস্ত সুন্নতের মধ্যে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করাও রয়েছে। যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় তোমরাও ঘরে সালাত আদায় কর, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতসমূহ ত্যাগকারী হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতসমূহ ত্যাগ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি উত্তরূপে ওযু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে অগ্রসর হয় তার প্রত্যেক কদমে একটি করে নেকী লেখা হবে, একটি করে গুনাহ মাফ হবে। এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকত না। এমনকি যে ব্যক্তি দু'জনের উপর ভর করে যেতে পারত তাকে জামাআতের সাথে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।[১]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে মসজিদের দিকে গমন করল অতঃপর গিয়ে দেখলো লোকেরা সালাত শেষ করে ফেলেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে সালাত

[১] মুসলিম : ১/৬৫৪

আদায়কারীদের সমপরিমাণ সওয়াব দিবেন। এতে তাদের সওয়াব বিন্দু মাত্র কম হবে না।

জামাআতের গুরুত্ব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের কিছু দৃষ্টান্ত :

তাদের ইবাদাত ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তারা মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ব্যাপারে ছিলেন খুবই আগ্রহী। যেমন তাবেঈদের সরদার সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ. বলতেন, চল্লিশ বছর যাবৎ আমার জামাআতের সাথে সালাত ছুটেনি।

ইবনে মুসাইয়্যাবের আযাদকৃত গোলাম বুরদা বলেন, চল্লিশ বছর যাবৎ যখনই মসজিদে আযান দেয়া হয় তখনই সাঈদ মসজিদে থাকতেন।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অভ্যাস ছিল যদি তাদের তাকবীরে উলা ছুটে যেত তাহলে তিনদিন তারা শোক প্রকাশ করতেন। আর যদি জামাআত ছুটে যেত তাহলে সাতদিন শোক প্রকাশ করতেন।[১]

মোল্লা আলী কারী রহ. তার সাথে সংযোজন করেছেন যে, যদি জুমু'আ ছুটে যেত তাহলে সত্তর দিন শোক প্রকাশ করতেন।

হাতেম আল-আসাম রহ. বলেন, দুনিয়ার মুসীবতের চাইতে দ্বীনের মুসীবত বড়। আমার একটি মেয়ে মারা গিয়েছে তখন দশ হাজারের চেয়েও বেশি লোক আমাকে সমবেদনা জানিয়েছে, অথচ আমার জামাআতে সালাত ছুটে গেছে তখন কেউ আমাকে সমবেদনা জানায়নি।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যারা জামাআতের সাথে তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার কারণে কান্নাকাটি করতেন। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আবার তাদের মাঝে এমনও কিছু লোক ছিলেন যাদের সংখ্যা প্রায় নব্বই এর কাছাকাছি ফরয সালাত একাকী দুইবার আদায় করলে বলতেন, মনে হয় যেন আমি সালাতই আদায় করিনি। তাদের মধ্যে একজনের চল্লিশ বছরে মাত্র একবার জামাআতে সালাত ছুটেছে তাও যখন তার মাতা মারা গেছেন। তার কাফন-দাফনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ'মাশ, এর ব্যাপারে ওয়াকী' ইবনে জাররাহ বলেন, আ'মাশের প্রায় সত্তর বছর তকবীরে উলা ছুটেনি।

[১] তুহফাতুল আহওয়াযী। ২/৪৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে আদায় করার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করেছেন। এ এক বড় ইবাদাত এবং আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। ইসলামের বড় প্রতীক, যার ফযীলতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার ফযীলতকে ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা তার উপর নির্জনতা অগ্রাধিকার পাবে। জামাআতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে একাকী হবে। মসজিদে দোয়া ও সালাত পড়ার চাইতে কবরস্থানে দোয়া ও সালাত পড়াকে উত্তম মনে করবে। অবশ্যই ধর্মের ফাঁদ খুলে যাবে। মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে বলব না যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং মর্যাদাসমূহ উচ্চ করেন? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টের সময় যথাযথভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপে যাওয়া, এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা– এগুলোই হচ্ছে সীমান্ত প্রহরা। কথাগুলো তিনি তিনবার বলেছেন।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿الأنبياء:١٠٥﴾

"আমি উপদেশের পর যাবূরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿الأنبياء:١٠٦﴾

"এতে ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে"।[২]

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওই সকল লোক জান্নাতের উত্তরাধীকার লাভ করবে যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

[১] সূরা আম্বিয়া: ১০৫

[২] সূরা: আম্বিয়া- ১০৬

لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿الأنبياء:١٠٦﴾

"এরমধ্যে যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে ও রমজানে রোজা রাখে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে"।

সালাত কোন্ ধরনের ইবাদাত :

অবশ্য বান্দাকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সালাত প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অস্তিত্বশীল বিষয়ের উপর বিজয়ী হবে। তার আত্মা, জিহ্বা, ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিমগ্ন হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ﴿البقرة:٢٣٨﴾

"আল্লাহর অনুগত্য হয়ে দণ্ডায়মান হও"। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- নিশ্চয় সালাতে ব্যস্ততা রয়েছে।[১]

তাই সালাত আদায়কারীর জন্য খাওয়া-পান করা, এদিক-সেদিক তাকানো ও নড়াচড়া করা হারাম। তবে সালাত ব্যতীত অন্যান্য ইবাদাত যা কতেক অঙ্গের উপর ফরজ কতেক অঙ্গের উপর ফরজ নয়। তাই রোজাদার কথা বলবে, নড়াচড়া করবে। মুজাহিদ এদিক সেদিক তাকাবে ও কথা বলবে।

হাজীগণ খাবে ও পান করবে, পক্ষান্তরে সালাত, তাতে দাসত্বের রং রয়েছে- যা আত্মা, বুদ্ধি, শরীর ও জিহ্বাকে শামিল করে। তাই সালাত দ্বীনের ভিত্তি বাকি রাখার সহায়ক। কারণ সালাত বান্দাকে প্রভুত্বের মাহাত্ম্য ও দাসত্বের বশ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সওয়াব ও শাস্তির আদেশ করে সে সময় তার উপর সৎকর্মে অনুগত্য করা সহজ হবে। কারণ কুরআনে কারীমে ইবাদাতের মধ্য থেকে সালাতের আলোচনাই বেশি করা হয়েছে। কখনো নির্দিষ্টভাবে সালাতেরই আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴿هود:١١٤﴾

"সালাতের পাবন্দী কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে"।[২]

কখনো কখনো সবরের সাথে সালাতকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

[১] বুখারী, মুসলিম

[২] সূরা: হূদ- ১১৪

﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾البقرة:١٥٣

"হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও"।[১]

যেখানেই আল্লাহ তা'আলা সালাতকে অন্য কোন ফরজের সাথে সংযুক্ত করেছেন সেখানেই সর্বপ্রথম সালাতকে উল্লেখ করেছেন।

কখনো কখনো সালাতকে অনেকগুলো কল্যাণকর আমলের শুরুতে ও শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল মুমিনূন ও আল–মাআরিজের শুরুতে লক্ষ্য করা যায়।

ইবনে কাইয়ূম রহ. বলেন, সালাত যখন কিরাআত, জিকির ও দোয়ার সমন্বিতরূপ, তখন তা দাসত্বের সকল অংশকে পরিপূর্ণভাবে শামিল করে নেয়। সালাত শুধুমাত্র কিরাআত জিকির ও দোয়া থেকে উত্তম। কারণ এগুলো সবই অঙ্গ–প্রতঙ্গ অনুগত্যে সালাতে একত্রিত হয়েছে।

সালাত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতীক :

যেমনভাবে সালাতের দ্বারা কোন ব্যক্তি থেকে কুফরের হুকুম উঠে যায়, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলার অনুসরণ করবে, আমাদের জবাইকৃত পশু খাবে সেই মুসলমানের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের নিরাপত্তা রয়েছে। সুতরাং তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহকে লজ্জিত করো না। তেমনিভাবে ইসলামের নিদর্শন ও তার হুকুম আহকাম প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা রাষ্ট্র থেকে কুফরের হুকুম উঠে যাবে তার জন্য ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হবে। যখন কোন শহরে আজান শোনা যাবেনা, মসজিদ পাওয়া যাবে না, তখন সে রাষ্ট্রটি অমুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার প্রমাণ করে। আর যখন আযান শুনা যাবে, মসজিদ পাওয়া যাবে, তখন রাষ্ট্রটি ইসলামী রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের সাথে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করতেন না। সকাল বেলা যদি ফজরের আজান শুনতেন তবে তাদের বিরত যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতেন আর যদি আজান না শুনতেন, তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করতেন।

[১] সূরা বাকারা : ১৫৩

ইমাম ইসাম আল মুযনী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সৈন্যদলকে পাঠাতেন তখন বলতেন, যখন তোমরা কোন মসজিদ দেখবে কিংবা আযান শুনবে তখন কাউকে হত্যা করবে না।[১]

সালাত মুমিনের বিপদ-পেরেশানীতে আশ্রয়-ভরসা :

সালাতের মধ্যে আছে দীনতা-দুর্বলতা, প্রার্থনা-দোয়া, মোনাজাত ও আশ্রয় গ্রহণ এক কথায় তাবৎ মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি সাড়াদান।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾البقرة: ١٥٣

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"।[২]

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾البقرة:٤٥

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এটি বিনয়ীগণ ব্যতীত সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন"।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখায় আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, পরকালীন জীবনের সফলতা ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফারায়েয এবং সালাতের উপর ধৈর্য-সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

তিনি আরো বলেন, সালাত হচ্ছে কাজ ও সংকল্পে সুদৃঢ় থাকার সবচে' বড় সহায়ক শক্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন,

[১] আলকালবী : ৩৩০-৩৩৫

[২] সূরা বাকারা:১৫৩

[৩] সূরা বাকারা:৪৫

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿الحجر:٩٧-٩٩﴾

"আমি অবশ্যই জানি তাদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর মৃত্যু উপস্থিত হওয়া অবধি"।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের দুশমনদের কথায় তার হৃদয়-মন ব্যথিত, সংকুচিত হলে সালাত ও জিকিরে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এগুলোতে রয়েছে মনের প্রশান্তি ও প্রশস্ততা এবং দুঃখ পেরেশানী লাঘবের উপকরণ।

আর রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-রীতিও ছিল এমনই। যখনই কোন বিষয়ে চিন্তিত বোধ করতেন, দ্রুত সালাতে মশগুল হয়ে যেতেন। হুযায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন :

رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. (حسن)

আহযাব রজনীতে আমি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি তখন চাদর আবৃতাবস্থায় সালাত আদায় করছিলেন। আর রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই ছিলেন যে, যখনই কোন বিষয়ে চিন্তিত বোধ করতেন সালাতে মশগুল হয়ে যেতেন।

আমিরুল মুমিনীন আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

বদর রজনীতে আমি আমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখলাম আমাদের একজন লোকও জেগে নেই, সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধুমাত্র রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি একটি বৃক্ষের নিকট সকাল অবধি অবিরত সালাত ও দোয়া-মুনাজাতে ব্যস্ত ছিলেন।

---

[১] সূরা আল হিজর : ৯৭-৯৯

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة نادى بأهله : صلوا صلوا، قال :
ثابت وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.

অভাব-অনটন দেখা দিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিজনদের এই বলে আহ্বান করতেন, তোমরা সালাত আদায়ে প্রবৃত্ত হও, তোমরা সালাতে নিমগ্ন হও। সাবেত বলেন, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামদের অবস্থা এমনই ছিল যে, তাঁদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বিপদ আপতিত হলে তারা সালাতে মশগুল হয়ে যেতেন। সাহাবী আবুদ্দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة، كان مفزعه إلى المسجد حتى
تسكن الريح، وإذا حدث في السماء خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة
حتى ينجلي.

প্রবল ঝড়-বাতাসের রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গন্তব্যস্থল হত মসজিদ, যতক্ষণ না ঝড়-তুফান বন্ধ হত। আর আকাশে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দেখা দিলে তা গ্রহণমুক্ত হয়ে আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গন্তব্যস্থল হত সালাত, তাতেই তিনি মশগুল থাকতেন।[১]

একজন সৈনিকের কাছে তার তলোয়ারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, একজন ধনবান ব্যক্তির নিকট তার ধন–সম্পদের আবেদন ও প্রয়োজন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর প্রতিটি সাহাবী এবং প্রত্যেক যুগে তাঁদের প্রকৃত অনুগামীদের নিকট সালাতের আবেদন ও অবস্থান। তাঁ তাঁদের তলোয়ার ও সম্পদকে যেরূপ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এগুলোর মূল্যায়ন করতেন, সাহাবা ও তাবেঈগণ সালাতকে সেরূপ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করতেন এবং অনুরূপ মূল্যায়ন করতেন। সালাতের উপর তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল খুবই দৃঢ়। ভরসা ও নির্ভরতা ছিল অনেক মজবুত। বরং সালাত পরিণত হয়েছিল তাদের

---

[১] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ও মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ

অবিচ্ছেদ্য স্বভাবে। যখনই কোন বিষয়ে তাঁরা শঙ্কিত হতেন বা শত্রুর আক্রমণের দুঃসংবাদ আসত অথবা বিজয় বিলম্বিত হত কিংবা কোন বিষয় জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে যেত, তখনই সালাতের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। দ্রুত নিজদেরকে প্রত্যার্পণ করতেন সালাতে। এমনই ছিল ইসলামের সোনালী যুগের বীরশ্রেষ্ঠদের বর্ণিল ইতিহাস। মুসলিম বীর সেনানীরা নিজদের জীবনকে ঠিক তেমন করেই রঙিন–বর্ণময় করেছিলেন সালাতের মাধ্যমে। যেন সালাতই ছিল তাদের সব কিছুর আধার।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, যখন তাঁর নিকট কোন আয়াত জটিল বা অস্পষ্ট মনে হত, সাথে সাথে কোন জন মানব শূন্য মসজিদ পানে ছুটে যেতেন এবং সালাতে নিমগ্ন হয়ে দীর্ঘ সিজদায় পড়ে– মহান আল্লাহর দরবারে সকরুণ আকুতি পেশ করতেন: হে ইবরাহীমের শিক্ষাদানকারী, আমাকে শিখিয়ে দিন। হে সুলাইমানের জ্ঞানদানকারী, আমাকে জ্ঞান-বুঝ দান করুন। তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট খুবই অনুনয়কারী–অতিশয় বিনীত।

ভয়–ভীতি ও দুশমনের আক্রমণ আশঙ্কার ক্ষেত্রে রয়েছে সালাত (সালাতুল খাওফ)। রয়েছে খরা-অনাবৃষ্টির সময় যেমন সালাতুল ইস্‌তিস্‌কা, তদ্রূপ গুনাহ-ভ্রান্তি, অন্যায় ও অপরাধ থেকে মার্জনার জন্য রয়েছে সালাত–সালাতুত তাওবা।

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ، فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له.

কোন বান্দা যখনই কোন অন্যায়-অপরাধ করে অতঃপর খুব ভালভাবে ওযু করে- পবিত্রতা অর্জন করে এরপর দু'রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন।

ইসলামের অন্যতম বিধান–দু'আর একটি স্বাভাবিক আদব হল দু'আর পূর্বে একটি নেক আমল উপস্থাপন করে দু'আ করা। সুতরাং কারো মনে যদি আকাঙ্খা জাগে যে, তার পেরেশানী দূর হোক বা প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাক তাহলে সে এ রীতির অনুবর্তিতায় নিজ সাধ্যমত দু'রাকআত সালাত আদায় করে দু'আ করতে পারে।

উসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

أن رجلا ضرير البصر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدع الله لي أن يعافيني فقال : إن شئت أخرت لك وهو خير لك وإن شئت دعوت فقال : أدع الله ، فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو... (صحيح)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন: আপনি আমার আরোগ্যদানের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি চাইলে আমি বিলম্ব করব। আর সেটিই হবে তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর। আর যদি চাও তাহলে দু'আ করতে পারি। তিনি নিবেদন করলেন: দু'আ করুন। তখন নবীজি তাকে ওযু করার নির্দেশ দিয়ে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করত: দু'রাকআত সালাত আদায়ান্তে দু'আ করতে বললেন।[১]

ফরজ সালাতগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ওয়াক্ত মত নামায আদায় করতে হয়। বরং সালাত হচ্ছে মুমিনের ঢাল ও হাতিয়ার এবং স্থায়ী চাবি যার মাধ্যমে সকল বন্ধ তালা খোলা যায়। যার মাধ্যমে দূর করা যায় সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

সালাত অন্যায়-অপরাধের কাফফারা :

বিশিষ্ট সাহাবী উবাদা বিন সামেত রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوئهن وصلا هن لوقتهن، وأتم ركوعهن، وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفرله، وإن شاء عذبه. (صحيح)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যা আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি খুব ভাল করে ওযু করবে, সময় মত তা আদায় করবে, রুকূ-সিজদা একাগ্রতা পরিপূর্ণ করে সম্পন্ন করবে তার জন্যও আল্লাহ তা'আলার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে,

[১] হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে এগুলো করবে না, তার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করবেন আবার চাইলে শাস্তিও দিবেন।[১]
আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন:

الصلوات الخمس كفارة لما بينها...

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার মধ্যবর্তী সময়ের (পাপের) কাফ্ফারা...।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه.

বান্দা যখন সালাতে দণ্ডায়মান হয়, তার যাবতীয় গুনাহ উপস্থিত করে মাথা ও উভয় কাঁধে রাখা হয়। এরপর যখনই সে রুকূ-সিজদা করে (এক এক করে) তার গুনাহ ঝরে পড়তে থাকে।
আবু আইয়ূব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل.

যে ব্যক্তি নির্দেশ মোতাবেক ওযু করে এবং নির্দেশ মোতাবেক সালাত আদায় করে, তার পূর্বকৃত সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
এ হাদীস ওযু ও সালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণের গুরুত্বের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করছে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

صلوا كما رأيتموني أصلي.

“তোমরা সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ”। এর দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখার প্রতি তাগিদ দিচ্ছে।

[১] সহীহ

বান্দা যদি অবাধ্যতায় জড়িয়ে কোন পাপ করে ফেলে অতঃপর পবিত্র হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে উক্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।
আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি:

ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ الآية ...

যখনই কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে ফেলে। অতঃপর পবিত্রতা অর্জনপূর্বক সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿آل عمران: ١٣٥﴾

“এবং যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা (কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে) নিজের উপর জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কে ক্ষমা করবেন? আর তারা যা করেছে জেনে-শুনে বারবার তা করেনা”।[১]
আর আমর ইব্ন আবাসা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে:

فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه، ومجده بالذي هو له أهله وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. (مسلم)

আর সে যদি সালাত আদায় করত: আল্লাহর প্রশংসা করে, তার গুণাবলী বর্ণনা করে, তার শান ও মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ মহিমা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর জন্য স্বীয় অন্তর খালি করে ফেলে তাহলে সে নিজ গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে এমনভাবে ফিরে আসে যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।[২]

আমি কেন সালাত আদায় করব?

[১] সূরা আলে ইমরান:১৩৫
[২] মুসলিম

সালাত মানব জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া:

স্বাধীনতা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিশ্বের আনাচে কানাচে–প্রতিটি স্থানে ধ্বনিত-অনুরণিত ও উচ্চারিত হচ্ছে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা নামক এ মৌলিক বিষয়টি। তবে সফলতার চিত্র অঙ্কন করতে গেলে যে চিত্রটি সকরুণভাবে দৃশ্যমান হয়, তা হচ্ছে, কেবলমাত্র কিছু বক্তৃতা-বিবৃতি-স্লোগান ও নানা কথার ফুলঝুরি। আর মনে লালিত স্বপ্ন ও স্বাধীনতার প্রতি প্রবল টান। ব্যাস! সফলতা বলতে এটুকুই।

বিভিন্ন দল-সংগঠন-সংস্থা স্বাধীনতার মৌল ভিত্তি সম্পর্কে তাদের বুঝ ও ধ্যান ধারণা অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মুখাপেক্ষিতা ও বশ্যতাপ্রবণ। সৃষ্টিগতভাবেই এ প্রবণতা তার স্বভাবে মিশে আছে। তার এ প্রকৃতির কারণেই সাগ্রহে উদ্যোগী হয় বিনয়-বশ্যতা, হীনতা ও নীচতার প্রতি। প্রত্যাবর্তিত হয় সার্বিক অমুখাপেক্ষীতার মালিক , সকল শক্তির উৎস, মহান সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের প্রতি।

কবি বলেন:

والفقر وصف ذات لازم لي أبدا ــ كما الغنى أبدا وصف له ذاتي

দারিদ্র্য-মুখাপেক্ষিতা চিরন্তন সত্তাগত স্বভাব আমার
যেমন শাশ্বত অমুখাপেক্ষীতা সত্তাগত প্রকৃতি তাঁর।

এ মূল রহস্যের কারণেই –বোধকরি– মানুষের অবস্থা স্থির হতে পারে না, তার হৃদয়-মন প্রশান্তি লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজ মাওলা ও প্রভুর নিকট সর্বস্ব সমর্পণ করে। তাঁর নির্ভেজাল আনুগত্যে নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দেয়। সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁর দিকেই ধাবিত হয়। তাঁর উপরই আস্থা রাখে। তাঁকেই স্মরণ করে আপদে-নিরাপদে। কেননা এ দাসত্ব ও আনুগত্যই হচ্ছে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর। আযাদী ও মুক্তির সর্ব শেষ চূড়া। কারণ, ফকীরসর্বস্ব বান্দা যখন অভাবহীন শাশ্বত শক্তিমান একমাত্র মাওলার বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং তার আনুগত্যে নিজকে সতত সমর্পণ করে, তখন থেকে সে ভিন্ন ভিন্ন তাবৎ শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রভাব– বলয় থেকে নিজকে মুক্ত ও স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। আসমান–জমিনের সৃষ্টিকর্তা-মালিক ভিন্ন অন্য কারো দিকে অন্তর ধাবিত হয় না। কারো জন্যই মাথা নিচু হয় না। কারো বশ্যতা স্বীকার করতেই মন প্রস্তুত হয় না।

বিশ্ব বিখ্যাত গবেষক ড. ওমর সুলায়মান আল-আশকার বলেন:

إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها، العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها، فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود يظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، قال تعالى : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا الآية : الجاثية

"ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের যে ধারণা ও বুঝ দেয়া হয়েছে, সেটিই হচ্ছে মূলত স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ স্তর এবং সর্বোচ্চ রূপ-রেখা। আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব যদি বাস্তবিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, সে সৃষ্টিকুলের কর্তৃত্ব-বলয় ও তাদের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে গেল। সুতরাং একজন মুসলিম এ বিশ্ব চরাচরকে দেখবে একজন কর্তৃত্ববান-প্রভাবশালীর দৃষ্টিতে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ধরাপৃষ্ঠের যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্যই এবং সব কিছুকে আমাদের বশীভূতও করে দিয়েছেন"।

ইরশাদ হয়েছে :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الجاثية:١٣﴾

আর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী।[১]

বিষয়টি যখন এমনই তাহলে একজন মুসলিম কোনক্রমেই এ সৃষ্টির কাছে নত ও অনুগত হতে পারে না। কোন ব্যাপারে তাদের কাছে ছোট হতে পারে না। কেননা তাবৎ সৃষ্টিকুলের মর্তবা-মর্যাদা মানুষ থেকে নিম্নস্তরের বরং তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের সেবাদানের জন্য। অনুরূপভাবে একজন মুসলমান তার

[১] জাছিয়া : ১৩

মতই একজন মানুষকে তার অনুগত দাসে পরিণত করতে পারে না। কেননা মানুষ বলতেই (আনুগত্য স্বীকার কারী) দাস। তার সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের জন্যই তার অস্তিত্ব-আবির্ভাব। তাই সে স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। সুতরাং একজন দাস অপর দাসকে নিজের দাস বানাতে পারে না।

কিছু মানুষ আছে যারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহর তার অনুবর্তিতা বাদ দিয়ে স্বাধীনতা বাস্তবায়নে সক্ষম। এরা নিঃসন্দেহে ভুলের মাঝে আকণ্ঠ ডুবে আছে। কারণ সকল মানুষ বরং তাবৎ সৃষ্টির অনুগত গোলাম হয়েই বেঁচে আছে এবং থাকবে। তাই সে আনুগত্য করুক বা অস্বীকার করুক। হ্যাঁ, এক দাসত্ব থেকে অন্য দাসত্বে পরিবর্তিত হতে পারে। দাসত্ব ও গোলামী থেকে বের হয়ে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ নেই। বেশির বেশি এতটুকু হতে পারে যে, আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের হয়ে তাগূতের দাসত্ব করবে। মূর্তি, প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র কিংবা ইউরো ,ডলার ইত্যাদির কাছে নিজকে সমর্পণ করবে। এ ধরণের লোকদের আল্লাহ তা'আলা খোলামেলাভাবে তিরস্কার করেছেন, নিন্দা জানিয়েছেন তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের। যথাঃ-

﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾المائدة:٦٠﴿

"আর তাদের কতক বানর, শূকর এবং তাগূতের গোলাম-উপাসনাকারী বানিয়ে দিয়েছেন।[১]"

যারা টাকা পয়সা, ধন-দৌলত ভোগ-বিলাসকে নিজদের জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, ইসলামী শরীয়তও তাদেরকে একইভাবে ঐ সব বস্তুর গোলাম হিসেবে বিবেচনা করে। ইমাম বুখারী রহ. সাহাবী আবুহুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس وانتكس وإذا شيك فلاانتقش...

"ধ্বংস হয়েছে দীনারের গোলাম, ধ্বংস হয়েছে দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হয়েছে পোশাকের গোলাম। ধ্বংস হয়েছে, পুনরায় ধ্বংস হয়েছে..."।

[১] সূরা মায়েদা:৬০

আর প্রকৃত স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয় সালাতের মাধ্যমেই। কারণ একনিষ্ঠ বিনয় সংবলিত সালাত, যা একজন মুসলিম পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সাথে তার রূহ–হাকীকত–আদব সহকারে সময় মত আদায় করে; সে সালাত কখনও একাত্ম হয় না গাইরুল্লাহর ইবাদাত-আনুগত্য, মানুষের দাসত্ব ও জাহেলী জীবনাদর্শের সাথে। যার বাহ্যিক রূপ হচ্ছে শির্ক-পৌত্তলিকতা, বিভিন্ন কুসংস্কার এবং উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। যেমন আমরা বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যুগে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি। সালাতের প্রত্যেকটি রুকন এবং সালাত আদায়কারী তাতে যা পাঠ ও ঘোষণা করে তার সবগুলোই গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতকে অস্বীকার করে খুব দৃঢ়তার সাথে এবং বিরোধিতা করে জোরালোভাবেই।

যেমন সালাত আদায়কারী সালাত শুরুই করে الله أكبر [আল্লাহ সব চেয়ে বড়] বাক্যের মাধ্যমে। যার দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর বড়ত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং এদের আনুগত্য ও বশ্যতার বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়।

এরপর সে পাঠ করে:

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾الفاتحة:٢﴿

"সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তা'আলার জন্যই"। এর মাধ্যমে সে ঘোষণা করছে, তিনি ভিন্ন আর কোন রব ও প্রতিপালক নেই এবং তিনি ব্যতীত কারো প্রশংসা নেই। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ এ পর্যায়ের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়।

সালাত আদায়কারী তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করে,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾الفاتحة:٥﴿

ঘোষনা পত্রের মাধ্যমে যে, তিনি ভিন্ন আর কারো ইবাদাত নেই এবং আর কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যও নয়। সাহায্য একমাত্র তার নিকটই চাইতে হবে। তিনি ব্যতীত আর কারো নিকট চাওয়া যাবে না।

একইভাবে সে বিরোধিতা প্রকাশ করে রুকূ-সিজদার মাধ্যমে। যে শারীরিক ও আন্তরিকভাবে সম্পাদনযোগ্য যাবতীয় রুকূ অনুরূপভাবে গোপনীয় ও বাহ্যিক সকল প্রকার সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই সম্পাদন করতে হবে। তিনি

ব্যতীত কারো নিকট মাথা নত করা যাবে না। বরং তিনি ভিন্ন কারো এ যোগ্যতাই নেই যে কেউ তাদের কাছে মাথা নত করবে।
একারণেই যুগে যুগে দেখা গিয়েছে, যাদের মধ্যে সালাত তার তাত্ত্বিক দিকগুলোসহ- বাস্তবায়ন হয়েছে তারাই বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর সামনে সর্বাধিক সাহসী মানুষরূপে পরিচিতি পেয়েছেন। এবং হক ও সত্য প্রকাশে থেকেছেন সদা নির্ভীক। যেমন রিবঈ ইবন আমের রাদিআল্লাহু আনহু যিনি পারস্য সেনাপতি রুস্তম এর নিকট দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন পার্থিব ভোগ-সামগ্রীর প্রতি সর্বাধিক নিরাসক্ত এবং সীমালঙ্ঘন ও পাপ কাজ থেকে অনেক অনেক অধিকতর দূরে অবস্থানকারী।

সালাত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির শুকরিয়া :

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে তার অনুগ্রহ-অনুকম্পা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে স্থির করেছেন। অনুগ্রহ বৃদ্ধির সাথে সাথে শুকরিয়া আদায়ও বৃদ্ধি পাবে, পেতে থাকবে। আরো স্থির করেছেন আমারা যেন দিন-রাত সদা-সর্বদা নিরলসভাবে সপ্রশংস তাসবীহ পাঠকারী ফেরেশতাদের অনুরূপ হয়ে যাই বরং রুকূ-সিজদা, অবিরাম তাসবীহ ও নিরলস জিকিরে নিমগ্ন থাকার ক্ষেত্রে আমরা তাদের থেকেও বেশী হকদার। তাই এ প্রতিযোগিতার ময়দানের সাথে মিল রেখেই সালাতের বিধানকে সাজানো ও কার্যকর করা হয়েছে।
আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿النحل:١١٤﴾

"তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই ইবাদাত করে থাক "।[১]
সালাত সর্বোত্তম আমল, সুতরাং একে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলেই জ্ঞান করতে হবে।
আল্লাহ তা'আলা যখন নিজ খলীল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বলে এই বলে সুসংবাদ দিলেন :

[১] সূরা নাহাল :১১৪

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿الكوثر:١﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি"।[১]
কাউসার হচ্ছে অনেকগুলো কল্যাণ ও নিয়ামতের সমষ্টি। জান্নাতস্থ কাউসার নির্ঝরিণী ও হাউজ তারই অন্তর্ভুক্ত।
এ সুসংবাদের পরপরই এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿الكوثر:٢﴾

"সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় ও কুরবানী কর"।[২]
অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যখন তাঁকে "মহান বিজয়ের" মূল্যবান নিয়ামত দান করা হয় তখন সাথে সাথে তিনিও মহা-প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দেখিয়ে উম্মে হানী বিনতে আবী তালেবের ঘরে প্রবেশ করলেন। বিবরণটি সহীহ বুখারীতে এ ভাবে বিবৃত হয়েছে:
মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানীর ঘরে গোসল করেছেন অতঃপর আট রাকআত সালাত আদায় করেছেন।[৩]
সাহাবী আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يجزي عنه ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

তোমাদের প্রত্যেকেই প্রতিদিন সকালে শরীরের প্রত্যেক জোড়ার উপর একটি করে সদকা নিয়ে উপনীত হও। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানালাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিলাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইলালাহ) একটি সদকা, সৎ কাজের আদেশ একটি সদকা, অসৎ কাজ থেকে বারণ একটি সদকা, চাশতের দু-রাকাত সালাত এ সবগুলোর

[১] সূরা কাওছার :০১
[২] সূরা কাউসার:২
[৩] বোখারী-হাদস নং ৪২৯২

পরিবর্তে যথেষ্ট ।[১] সাহাবী আবু বুরদা রাদিয়ালাহু আনহু বলেন : আমি রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি :

في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق من كل مفصل منها صدقة قالوا : فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك،

প্রত্যেক মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া রয়েছে। প্রত্যেক জোড়ার পরিবর্তে একটি করে সদকা করা তার উপর জরুরি। লোকেরা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এর সামর্থ্য রাখে কে? তিনি বললেন : মসজিদে নিক্ষিপ্ত থু থু মিটিয়ে ফেলবে, রাস্তা থেকে (কষ্টদায়ক) বস্তু অপসারণ করবে, যদি না পার, তাহলে চাশতের দু-রাকআত তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যাবে ।[২]

হে লোক সকল! যারা পার্থিব কাজে ব্যস্ত হয়ে সালাত নষ্ট করছ। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত– সুস্থতা, নিরাপত্তা, রিযক, সম্পদ ইত্যাদির কারণে প্রতারিত–প্রবঞ্চিত হয়ো না। আল্লাহর নেয়ামত-অনুগ্রহের মূল্য প্রদান কর। যথাযথভাবে তাঁর শুকরিয়া আদায় কর ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿لقمان:١٢﴾

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ ।[৩]

আল্লাহর নেয়ামতের মাধ্যমে তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। খুব সতর্ক হও। আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামতের মাধ্যমে তার অবাধ্যতায় প্রবৃত্ত হয়ো না। তার অকৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে যেয়ো না ।

সালাত মুসলির মর্যাদা বৃদ্ধি করে:

---

[১] সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৭২০, বাবু ইস্তেহবাবি সালাতিদ দোহা
[২] হাদিস নং ৪২৩৯
[৩] সূরা লোকমান: ১২

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ {الإسراء:٧٩}

এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে। এটি তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে ।[১]

দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে সালাতুল লাইলের পুরস্কার স্বরূপ মাকামে মাহমূদ দান করেছেন। এবং তিনি এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদাকর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ।

সাহাবী মু'আয বিন জাবাল রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন :

حدثني بعمل يدخلني الجنة! قال: بخ بخ سألت عن أمر عظيم وهو يسير لمن يسره الله به تقيم الصلاة المكتوبة! وتؤتي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا.

আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আল্লাহর নবী বললেন: বাহ্! বাহ্ ! তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এবং সেটি খুবই সহজ, যার জন্য আল্লাহ সহজ করেন। তুমি ফরজ সালাত গুলো কায়েম করবে। ফরজ জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না তথা কোন বস্তুকে তাঁর সমপর্যায়ের জ্ঞান করবে না ।[২]

সাহাবী রাবি'আ বিন কাব রাদিয়ালাহু আনহু বলেন:

كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه و حاجته فقال لي: سلني! فقلت: أسئلك مرافقتك في الجنة قال: أ غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.

আমি এক রজনী রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাপন করেছি। আমি তাঁর ওজুর পানি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে দিয়েছি। তখন তিনি

---

[১] সূরা ইসরা: ৭৯
[২] বোখারি

আমাকে বললেন: আমার কাছে কিছু চাও? আমি বললাম: আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য ও সান্নিধ্য প্রার্থনা করছি। নবীজি বললেন: এ ছাড়া অন্য কিছু? বললাম: এটিই। তখন তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার (এ মনষ্কামনা পুরণের) ব্যাপারে অধিক সেজদার মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা কর।[১]

আব্দুলাহ বিন আমর রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله ؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما و الناس نيام. صحيح

জান্নাতে একটি (বিশেষ) ঘর আছে। যার ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যাবে। আবু মালেক আল-আশআরী বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কাদের জন্য সে ঘরটি ? রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যারা ভাল ভাল কথা বলে, অপরকে খাবার দান করে এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় সালাতে রাত্রি অতিবাহিত করে।[২]

সাহাবী উকবা বিন আমের রাদিয়ালাহু আনহু বলেন : রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. مسلم

"যে কেউ খুব ভালভাবে ওজু করে একান্ত একাগ্রতার সাথে দু-রাকআত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে"।[৩]

সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন :

[১] সহীহ মুসলিম

[২] সহীহ

[৩] সহীহ মুসলিম

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهارا إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري.

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাদিয়ালাহু আনহুকে ফজরের সালাতের সময় জিজ্ঞেস করলেন : বেলাল তুমি তোমার সব চেয়ে কাঙ্ক্ষিত আমলটি সম্পর্কে আমাকে বলতো যা তুমি সম্পাদন কর? কারণ, জান্নাতে আমি আমার সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। উত্তরে বেলাল রাদিয়ালাহু আনহু বললেন : (বলার মত) তেমন আমল তো কিছু করিনি যা আমার নিকট কাঙ্ক্ষিত তবে, দিন বা রাতে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করি তখনই সে ওজু দিয়ে সাধ্য মত সালাত আদায় করি।[১]

সালাত রিযক আনয়নকারী :

একদিকে সালাতে নিয়োজিত হলে সাময়িক ভাবে হলেও পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়, কিছু সময় এ কাজে ব্যয় হয়, এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও পার্থিব কাজ ব্যহত হয়। অন্য দিকে কিছু লোক আছে যারা পৃথিবীর ভোগ সামগ্রী ও ধন-সম্পদ উপার্জন উপলক্ষে দুনিয়ার সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে অন্য কোন কাজের ফুরসত পায় না, এমনকি সালাত কায়েম করার সময়টুকু পর্যন্ত সেসব কাজে ব্যস্ত থাকে । এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন : ফরজ সালাত আদায়ের নিমিত্তে জীবনোপকরণ উপার্জন এবং যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা ফরজ। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ {الجمعة:٩}

[১] সহীহ বোখারী

হে ঈমানদার বান্দাগণ! জুমুআর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হলে তোমরা দ্রুত আল্লাহর জিকির পানে অগ্রসর হও। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য অধিকার কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝে থাক।[১]

আল্লাহর হক–সালাত আদায় সম্পন্ন হয়ে গেলে বৈধতা সম্পন্ন নির্দেশ দিয়ে বলেন: তারা যেন ব্যবসা, বাণিজ্য ও নিজ প্রয়োজন মিটানোর কাজে পৃথিবীতে বের হয়ে পড়ে।

ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ {الجمعة:١٠}

সালাত সম্পন্ন হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর। সাথে সাথে আল্লাহ কে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। এতে তোমরা সফল হবে।[২] অন্যত্র বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿المنافقون:٩﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৩]

মুফাসসিরীনদের বড় একটি দল এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন: আয়াতে জিকরুল্লাহ বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে নিজস্ব কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা সন্তানাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿النور:٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ...

---

[১] সূরা জুমুআ:৯
[২] সূরা জুমাআ:১০
[৩] সূরা মুনাফিকুন:৯

সে সকল গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেদিনকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।[১]

তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে সালাত দ্বারা ফরয সালাতসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এর একটি উপমা উপস্থাপন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴿النور:٣٥﴾

তার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের মধ্যে স্থাপিত।[২]

তারা হচ্ছেন "যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির-স্মরণ হতে বিরত রাখেনা। তারা মানুষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় করতেন কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন করতে পারত না।[৩]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিরত কিছু লোক আজান শুনলেন। শুনেই তারা নিজ পণ্য-সামগ্রী রেখে সালাতের উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন। তখন তিনি বললেন, এরাই সেসব লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 'এরা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির ও সালাত আদায় থেকে বিরত রাখেনা।[৪]

সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন, তারা বেচা–কেনা করতেন কিন্তু ফরজ সালাতের জামাআত ত্যাগ করতেন না।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দর করেইনা মিলিয়েছেন সালাতের জন্য তাদের রুজি-রোজগারের কর্ম বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কিত আপন

---

[১] সূরা নূর : ৩৬-৩৭
[২] সূরা নূর:৩৫
[৩] তাফসীরে বগভী : ৬/৫
[৪]তাফসীর তাবারী; ৯/৩২৪-৩৩১

বাণী তথা 'এমন লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিরত রাখতে পারে না' এবং পরবর্তী বাণী তথা-

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿النور:٣٨﴾

'যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের পুরস্কার সুন্দরকরে দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন'।[১]

উভয় বাণীর প্রথমটিতে ব্যবসা ত্যাগ কওে সালাতে মশগুল হওয়া কর্মেও প্রতিদান হচ্ছে দ্বিতীয় বাণীতে বর্ণিত কর্মের অধিক পুরস্কার প্রদান।

অতএব প্রমাণিত হল, রিযক আল্লাহর হাতে। যাকে ইচ্ছা দান করেন। যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। তিনি যাকে না দিয়ে বঞ্চিত করেন তাকে প্রদানকারী কেউ নেই। আর যাকে দিতে চান তাকে বঞ্চিতকারী কেউ নাই। এ ছাড়া সকলেরই জানা যে, বান্দা পাপের কারণেই রিযক থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর হক সম্পর্কে শিথিলতা প্রদর্শন অপেক্ষা জঘন্য পাপ আর কি হতে পারে?

উরওয়া বিন যুবায়ের যখন দুনিয়াদার লোকদের নিকট গিয়ে তাদের পার্থিব ধন-দৌলত প্রত্যক্ষ করতেন, তখন নিজ পরিজনদের নিকট ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করে তেলাওয়াত করতেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿طه:١٣١﴾

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না সেসব বস্তুর প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, এর দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত রিযক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[২]

অতঃপর পরবর্তী আয়াতের নির্দেশিকা পালন করনার্থে সাথে সাথে বলতেন, সালাত...সালাত...

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

[১] সূরা নূর : ৩৮– এর মধ্যে।
[২] সূরা তা-হা : ১৩১

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿طه:١٣٢﴾

এবং তোমার পরিজনবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার নিকট কোন রিযক চাই না। জিরিক আমিই তোমাকে দেই এবং শুভ পরিনাম তো মুত্তাকিদের জন্য।[১]

আমরা এ আয়াতে লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ বলছেন-

আমি তোমার নিকট রিযক চাই না বরং রিযক তো আমিই তোমাকে দেই।

কারো কারো মতে এমন সন্দেহ উদিত হতে পারে যে, সব সময় যদি সালাতেই মশগুল থাকি তাহলে জীবিকা ও আয়-রোজগারে প্রভাব পড়তে পারে। উপার্জনে সংকীর্ণতা আসতে পারে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ এদের এরূপ সন্দেহ খণ্ডন করেছেন। যেমন বলা হল : আয় রোজগার বা কামাই–উপার্জনের চিন্তা-পেরেশানী বাদ দিয়েই সালাতে মশগুল হও। কেননা তোমার রিজিকের দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করিনি। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে দায়িত্বশীল করিনি। কারণ রিযক তো আমিই দিয়ে থাকি। এ দায়িত্ব তো আমার।

এখানে আরবী বাক্য বিন্যাসের সাধারণ ধারার পরিবর্তে 'মুসনাদ ইলাইহ'কে আগে বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্দৃষ্ট করণ বা তাকওয়ার ফায়দা বুঝানো।

কারণ আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿الذاريات:٥٦-٥٨﴾

আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার আনুগত্য-এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোন রিযক চাইনা এবং এও কামনা করিনা যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই রিযকদাতা মহাশক্তির অধিকারী।[২]

[১]তা-হা ১৩২
[২] সূরা জারিয়াত : ৫৬-৫৮

আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, সালাত সাধারণভাবে রিযক আসা ও বৃদ্ধির উপকরণ এবং দুর্দশা মুসিবত দূর হওয়া কার্যকারণ।
আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারে অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পেলে পরিবারস্থ লোকদের সালাতের কথা বলতেন। এরপর তেলাওয়াত করতেন: তুমি নিজ পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও... ।
ইমাম আহমাদ রহ.সহ অন্যান্যরা জুহুদ সম্পর্কে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة : صلوا، صلوا، قال ثابت : وكان الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারে খাদ্যাভাব ও অনটন দেখা দিলে পরিবারস্থ লোকদের সালাতের দিকে ডাকতেন। বলতেন, তোমরা সালাত আদায় কর। তোমরা সালাত আদায় কর। সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের অবস্থাও এমনই ছিল যে, তাঁরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।[১]
আমরা যদি সম্পদ উপার্জনের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি। তাহলে বুঝতে পারব, এসব দেয়াই হয়েছে আল্লাহর হক বাস্তবায়নে সহযোগিতা নেয়ার জন্য। জীব-জন্তুদের মত শুধু উপভোগ ও মজা করার জন্য নয়। কারণ বনী আদম আমৃত্যু পৃথিবী ও তার ভোগ সামগ্রীর প্রতি লোভী ও আগ্রহী থাকবে। আর তার পেট কবরের মাটিই কেবল ভর্তি করতে পারবে।
সুতরাং সম্পদ যদি মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায় তাহলে ফরজ ও হিকমতও বিলুপ্ত হয়ে যাবে; যে দিকে লক্ষ্য করে সম্পদ অবতীর্ণ করা হয়েছে।
নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

[১] বোখারি, মুসলিম

لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت.

(حسن)

আদম সন্তান যদি তার (জন্য বরাদ্দকৃত) রিযক হতে ছুটে পালাতে যায় যেভাবে সে মৃত্যু হতে ছুটে পালায়। তাহলে অবশ্যই সে রিযক তাকে খুঁজে পাবে যেভাবে খুঁজে পায় তার মৃত্যু তাকে।[১]
নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجهلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولايحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لاينال ما عنده إلا بطاعته. (صحيح)

রুহুল কুদুস (জিবরীল) আমার অন্তরে ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণী তার (জন্য বরাদ্দকৃত) হায়াত ও রিযক পূর্ণ না করে কখনও মারা যাবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর ও বৈধভাবে (জীবিকা) অন্বেষণ কর। তোমাদের কারো রিযক পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া যেন তাকে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে অন্যায় উপায়ে রিযক অন্বেষণে প্ররোচিত না করে। কারণ আল্লাহর নিকটস্থ রিযক কেবলমাত্র তার আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।[২]
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন :

من كانت همه الآخرة، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. (صحيح)

যে ব্যক্তির ধ্যান-জ্ঞান (চিন্তা-চেতনা) হবে পরকাল। আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় বিষয়কে একত্র করে দিবেন। অন্তরকে করে দিবেন অভাবমুক্ত এবং দুনিয়া তার নিকট অনিচ্ছা সত্ত্বেও (বাধ্য হয়ে) আসবে। আর যার ধ্যান-জ্ঞান হবে

[১] হাদীসটি হাসান সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনায় ইমাম তবরানী, আওসাত গ্রন্থ। তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। মাজমাউজ যাওয়ায়েদ : ৭/৬৭
[২] হাদীসটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত

দুনিয়া আল্লাহ তার যাবতীয় বিষয়াদিকে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন এবং দারিদ্র তার চোখের সামনে উপস্থিত করে দিবেন। তদুপরি দুনিয়া ঠিক ততটুকুই আসবে আল্লাহ যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ করেছেন।[১]

সুতরাং সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল যে, বান্দা না চাইলেও রিযকপ্রাপ্ত হয়। এতে তার নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ আল্লাহর রিযক তার অনুমোদন ছাড়া কোন লোভীর লোভ টেনে আনতে পারে না এবং কোন অপছন্দকারীর অপছন্দ ও অনাগ্রহ রদ করতে পারে না। কারণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি শুকিয়ে গিয়েছে।

সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى ،وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. (صحيح)

আল্লাহ তা'আলা বলছেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত-আনুগত্যে একান্ত মনোযোগী হও আমি তোমার অন্তরকে অভাবমুক্ত করব। তোমার দারিদ্র মোচন করব। অন্যথায় তোমাকে বিভিন্ন ব্যস্ততায় ব্যস্ত করে দিব আর দারিদ্র দূর করব না।[২]

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে কিছু মানুষ আছে যারা দ্বীনদারি ও সালাতের তুলনায় দুনিয়ার খেদমতে নিমজ্জিত হয়ে যায় আকুণ্ঠ। অতঃপর যখন তারা উপদেশ গ্রহণ করে না এবং স্মরণ করে না যে, রিযক একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত বিষয় আর দুনিয়া অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর ও নৈতিক পন্থা অবলম্বন করা। তাদের কেউ কেউ যুক্তি উপস্থাপন করে বিতর্ক জুড়ে দেয় যে, রিযক নিরাপদ ও নিশ্চিত হওয়ার অর্থ তো এই নয় যে, আসবাব উপকরণ ত্যাগ করতে হবে।

[১] হাদীসটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত আল্লাহ আল্লাহ

[২] হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত

অতঃপর যখন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। বলে, নিশ্চয় আল্লাহ উদার-দয়াবান, দানশীল। আর পরকালের মহৎ-দানশীল-দয়াবান কি পৃথিবীতেও মহৎ ও দয়াবান নন?

জনৈক বুজুর্গ বলেন: 'তোমার জন্য যে বিষয়ে দায়িত্ব নেয়া হয়েছে এবং নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে সে বিষয়ে তোমার প্ররিশ্রম ও মেহনত এবং যা তোমার থেকে চাওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমার অলসতা ও অবহেলা তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ﴿النور:٢-٣﴾

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ (সংকটে) তার বের হওয়ার রাস্তা করে দেন এবং ধারণাতীত উৎস হতে তার রিযক দান করেন।[১]

যে ব্যক্তি সালাত আদায়কে অন্য সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময়ে দান করবেন সেসব পার্থিব জিনিস যা তার থেকে ছুটে গিয়েছিল এবং তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিযক দান করবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿الأعراف:٩٦﴾

যদি সেসব জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম।[২]

আর বান্দা অবশ্যই রিযক থেকে বঞ্চিত হয় পাপের কারণে যে পাপে সে জড়িত হয়। সুতরাং সালাত নষ্ট করার দুর্ভোগপূর্ণ মন্দ পরিণতি হচ্ছে, রিযক কমে যাওয়া এবং বরকত মিটে যাওয়া। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কিছু লোক আছে আপনি যদি তাদেরকে সালাতের প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে কাজ বন্ধ

[১] সূরা তালাক : ৫৫

[২] সূরা আরাফ : ৯৩

করতে বলেন, দেখবেন তাদের চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠবে। কেমন করে তারা সালাতের জন্য কাজ বন্ধ করবে, অথচ কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত! এহেন বক্তব্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সবখানেই শোনা যায় এমন যুক্তি অথচ এটি কোরআনের কোন আয়াত বা হাদীসে নববীর কোন অংশ নয়। বরং এটি এক প্রত্যাখ্যানযোগ্য ঘৃণ্য বক্তব্য। যে কাজ আপনাকে আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালন হতে বিরত রাখে সেটি কি ইবাদাত হতে পারে?! হ্যা সেটি ইবাদাত তবে আল্লাহর নয়; শয়তানের। ইবাদাত (আখিরাতের নয়) দুনিয়ার।

দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে কারো জন্য যদি সালাত ত্যাগ করা বৈধ হত তাহলে শত্রুর মোকাবেলায় ব্যস্ত মুজাহিদরা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন।

এদতসত্ত্বেও সালাত ত্যাগে তাদের ওজর-অজুহাত কবুল করা হয়নি বরং তাদের জন্য বিশেষ পদ্ধতি সম্পন্ন "সালাতুল খাওফের' নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রচণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও সালাত হতে বিরত থাকার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাকেও তার মত করে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। যাতে সালাতের আবিশ্যকতা আপন জায়গায় ঠিক থাকে। আর সালাতী নিজ সুবিধা মত আদায় করতে পারে।

সালাত ত্যাগ করা নিকৃষ্টতম কবিরা গুনাহ:

মুহাম্মদ বিন নসর আল-মারওয়াযী বলেন, আমি ইসহাককে বলতে শুনেছি: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে যে, সালাত ত্যাগকারী কাফের।

অনুরূপভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে একদল শরিয়তবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিহার করল এবং এরই মাঝে সে সালাতের সময়ও শেষ হয়ে গেল; সে কাফের।"[১]

ইমাম ইবনে হাযম রহ. বলেন: সময় মত সালাত আদায় না করা এবং অন্যায়ভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা; শিরকের পর সব চেয়ে বড় গুনাহ।[২]

ইমাম ইবনু কাউয়ূম আল জাওযি র. বলেন,

[১] আল ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইবনে হিব্বান ৪০০/৩২৮৭০৫

[২] কিতাবুল কাবায়ির লিযযাহাবী পৃ.২৬

এ ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোন ভিন্নমত নেই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ত্যাগ করা সব চেয়ে বড় অপরাধ। সব চেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহর নিকট এ অপরাধ হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠনের অপরাধের চেয়েও গুরুতর। এ পাপ যিনা-ব্যাভিচার, চুরি, মদ্যপানের পাপের চেয়েও বড়। সালাত ত্যাগকারী, আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার শিকার হবে।

ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী বলেন: সালাতকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে আদায়কারী-কবীরাগুনাহকারী (অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করা কবীরা গুনাহ) আর যে ব্যক্তি একেবারেই ত্যাগ করল অর্থাৎ এক ওয়াক্ত সালাত একেবারেই আদায় করল না। পাপের দিক থেকে সে যিনাকার ও চোরের সমতুল্য। কেননা প্রতিটি সালাত ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেয়া কবীরাগুনাহ। যে এ অপরাধ একাধিকবার সঙ্ঘটিত করল সে তওবা করার পূর্ব পর্যন্ত কবীরাগুনাহ সম্পাদন কারীদের অন্তর্ভক্ত। আর যে ব্যক্তি সদা–সার্বক্ষণিকভাবে এ সালাত ত্যাগ করার অপরাধে লিপ্ত সে হতভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আল্লামা ইবনুল জাওজী রহ. বলেন : সুস্থ শরীর সম্পন্ন সালাত ত্যাগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েজ নেই। অন্য মুসলমানদের পক্ষে তাকে খাওয়ানো, তার নিকট মেয়ে বিবাহ দেয়া এবং একই ছাদের নিচে তার সাথে বসবাস করা বৈধ নয়।[২]

সাহাবী আব্দুলাহ বিন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : যে সালাত ত্যাগ করল তার কোন দ্বীন নেই।" আব্দুলাহ বিন শাকীক আল আকলী সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী জ্ঞান করতেন না।[৩]

সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যার সালাত নেই তার ঈমান নেই। আর যার ওযু নেই তার সালাত নেই।[৪]"

যে ব্যক্তি সালাতের আবশ্যিকতা স্বীকার করে, তবে অলসতা করে তরক করে–সময় মত আদায় করে না, এ ব্যক্তির এ কাজটি কুফরী বলে ওলামায়ে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ আবার ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এরূপ

[১] আল কাবায়ির লিযযাহাবী পৃ. ২৮

[২] বাহরুদ্দুমু পৃ. ১৮৯)

[৩] (তিরমিযী-সহীহ)

[৪] সহীহ

ইখতেলাফ-মতবিরোধকে এক পাশে রেখে আমরা সালাত ত্যাগকারীর কানে গোপনে একটি কথা বলতে পারি। আচ্ছা আপনাকে ইসলাম ও তাওহীদপ্রিয় মুসলমান বলা হবে। সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত বলা হবে। এটি কি আপনার নিকট অপছন্দনীয়? তাহলে একটি মাসআলা সম্পর্কে বলুন। যে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন মাসআলাটি হল, আপনার সালাত ত্যাগ করা ও সময়মত আদায় না করা প্রসঙ্গে। একদল আলেমের বক্তব্য হল: আপনি কাফের মুশরিক হয়ে গিয়েছেন। আপনার রক্ত ও সম্পদ বৈধ–এর কোন নিরাপত্তা নেই। আপনি জীবিত থাকার অধিকার হারিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব মুরতাদ হিসেবে আপনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। কোন মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি আর আপনার সন্তাদের অভিভাবকত্ব করতে পারবেন না। আপনি ওয়ারিছ বানাতে পারবেন না। না আপনি তাদের উত্তরাধিকার পাবেন। আপনাকে গোসল দেয়া হবে না, আপনার জানাজা পড়া হবে না। মুসলমানদের কবরে আপনাকে দাফন করা হবে না। আপনি ফেরআউন , হামান, আবু জাহেল, আবু লাহাবসহ সকল কাফেরদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামের থাকার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছেন।
উলামাদের অন্য দলের মন্তব্য হল: না আপনি কাফের হননি। তবে আপনি ফাসেক, ফাজের। কঠিন গুনাহগার, গুরুতর অপরাধী যদি এরপর আবারও সালাত ত্যাগ করেন তাহলে আপনাকে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে এবং তা কার্যকরও করা হবে।[১]

সালাত ত্যাগ করা অন্ধকার ও দুনিয়া-আখেরাতে ধ্বংস :

সালাত ত্যাগ করা অন্তরকে অন্ধকার ও মুখকে কালো করে দেয়। কেননা ইবাদাত আনুগত্য হচ্ছে নূর ও স্বর্গীয় জ্যোতি আর অবাধ্যতা ও পাপ হল অন্ধকার।
সুতরাং এ অন্ধকার যত গাঢ় ও শক্তিশালী হবে পেরেশানীও বৃদ্ধি পাবে সে হারে। এক পর্যায়ে উক্ত অন্ধকার সে পাপী-সালাত ত্যাগকারীকে অজান্তেই পথভ্রষ্টতায় ফেলে দিবে। আর তখন থেকে তার ও অন্যান্য মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের সাথে একটা দূরত্ব ও শীতল সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। যখন সে এটি বুঝতে

[১] (সামান্য পরিবর্তনসহ: নাইলুল আওতার, আলামা শাওকানী : ১/২৯৯-২৯৩)

পারবে এবং উক্ত দূরত্ব আরো গাঢ় হবে তখন তাদের সংশ্রব থেকে দূরে সরে যাবে। এবং তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সাথে সাথে শয়তানের দলের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। রহমানের দলের সাথে যে পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি হবে, আনুপাতিক হারে শয়তানের দলের সাথে সে পরিমাণ ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাবে।[১]
পরিণতিতে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে শয়তানের দলেরই একজন হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন :

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿المجادلة:١٩﴾

তারা হচ্ছে শয়তানের দল। শুনে রাখ। শয়তানের দলই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।[২]
সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সাথে সালাত আদায় করবে এ সালাত তার জন্য কেয়ামতের দিন নূর ও দলীল হয়ে আর্ভিভূত হবে। আর যে একে সংরক্ষণ করবে না এটি তার জন্য কেয়ামতের দিন নূর–দলীল ও মুক্তি হবে না।

« من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ، ولا برهانا ، ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبي بن خلف الجمحي »

এবং কিয়ামত দিবসে উঠবে কারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খালফ এর সঙ্গী হয়ে'।[৩]
কতিপয় ইসলামি চিন্তাবিদ হাদীসটির বিশেষণ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত থেকে নির্লিপ্ত থাকবে সম্পদ অর্জনের কারণে তার হাশর হবে কারূনের সঙ্গে, আর রাজত্বের কারণে যে নির্লিপ্ত থাকবে তার হাশর হবে ফিরআউনের সঙ্গে, মন্ত্রীত্বের

[১] (আল- জাওয়াব আল কাফী : পৃ. ৪৯)
[২] (সূরা মুজাদালাহ:১৯)
[৩] (বায়হাকী: ২৬৯৭)

কারণে হলে হাশর হবে হামানের সঙ্গে, এবং যে নির্লিপ্ত থাকবে ব্যবসার কারণ দেখিয়ে তার হাশর হবে মক্কার কাফির ব্যবসায়ী উবাই বিন খালফের সঙ্গে।[১]
সুতরাং ওই ব্যক্তির চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ বিবেক আর কার? যে, আল্লাহর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাগণ অর্থাৎ – নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সৎকর্মশীলদের সঙ্গ বাদ দিয়েছে, সেসব ব্যক্তির সঙ্গের বিনিময়ে যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।
বন্ধু! পাপ কাজ করার পূর্বে একটু চিন্তা করুন, আপনি কে? আপনি তো সকলের মাবুদ সৃষ্টিকূলের রবের নাফরমানি করছেন। আপনি কে? একটু চিন্তা করুন, আপনি তো বড় দুর্বল, অসহায়। নিজের কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করার আপনি মালিক নন। গুনাহ করার পূর্বে স্মরণ করুন, আপনার উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের কথা। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন শূন্য হতে, রোগ থেকে সুস্থতা দান করেছেন, আর ভরে দিয়েছেন আপনাকে তার নিয়ামতরাজি দ্বারা। হে আল্লাহর বান্দা, আপনি এ অনুগ্রহকে কিভাবে অস্বীকার করছেন? কিভাবে অনুগ্রহের বিনিময়ে দিচ্ছেন অকৃজ্ঞতা? ওহে, মনে রাখুন, আপনি আল্লাহর নাফরমানি করছেন তাঁর রাজত্বের ভিতর, তাঁর যমীনের উপর, তাঁর আকাশের নিচে। আপনি কি রাজি হবেন? আপনার ঘরে, আপনার রাজ্যে, আপনার প্রভাবাধীন জায়গায় কেউ আপনার নাফরমানি করুক? সাবধান ! আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা, গুনাহ মার্জনাকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তওবা কবুলকারী, অপরাধকারীদের উপর থেকে তাঁর বাহিনীকে হঠানো সম্ভব নয়। তিনি মর্যাদাহানী মনে করেন যদি তাঁর অলঙ্ঘণীয় বিধান লঙ্ঘিত হয়। পূর্বেকার জাতি গোষ্ঠী তো এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছিল, তার নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করেছিল, গুনাহ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। হে বেখবর! ওহে নাফরমান! আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্যে, এক গুরু দায়িত্ব দিয়ে; নিরর্থক নয়, অকারণেও নয়।
'তোমরা কি ধারণা করেছ তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি, এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তণ করবে না?'
আল্লাহ আপনাকে সময় দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন যাতে নেক আমলের মাধ্যমে পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেন; এবং আপনি স্মরণ করুন আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও

[১] আসসালাতু ওয়া হুকমু তারিকিহা, পৃ২২।

অবকাশকে। আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দেন তবে একেবারে ছেড়ে দেননা। অতএব সাবধান! জেনে রাখুন! আল্লাহ নিযুক্ত করেছেন আপনার উপর 'সম্মানিত ফেরেস্তা' আপনি তাদের না দেখলেও তারা আপনাকে ঠিকেই দেখছে। তারা অবগত হন আপনি যা বলেন ও করেন। কিয়ামত দিবসে তারা আপনার বিপক্ষে স্বাক্ষ্য দিবে। এসব সাক্ষ্য থেকে পালানোর জায়গা আছে কি? সন্দেহ নেই আমরা প্রত্যেকেই গুনাহগার, পাপাচারী আমরা সবাই অপরাধী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوابُوْنَ.

'প্রত্যেক আদম সন্তান অপরাধী আর এর মাঝে উত্তম যারা তাওবা করে'।[১]
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে স্মরণ করুন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দেখছেন, আপনার সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি সর্বজ্ঞাত, মহাবিজ্ঞ, সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা। কুরআনে এসেছে-

يَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

'তিনি জানেন যা তোমরা গোপনে কর, আর যা তোমরা প্রকাশ্যে কর।[২]

ইসলামে মসজিদের ভূমিকা:

এতে কোন সংশয় নেই যে রাসূল –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম– মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র যে কাঠামোগুলোর উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মসজিদ হল সে কাঠামোগুলোর অন্যতম। হিজরতকালে তিনি হুইয়াই বিন আমর বিন আউফের নিকট কোবা নামক স্থানে অবস্থান করে কয়েকদিনের মধ্যে মসজিদে কোবার নির্মাণ শুরু করেন। আর এটিই হলো মদিনায় নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ।[৩] তাঁর নিয়ম ছিল সফর অথবা যুদ্ধকালে কোন জায়গায় অবতরণ করে, কিছু দিন অবস্থান করলে, সেখানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করতেন এবং সাহাবাদের নিয়ে তাতে সালাত আদায় করতেন। যেমন করেছেন 'খায়বর' এবং 'তাবুক'

[১] তিরমিজি, ইবনে মাজাহ
[২] তাগাবুন : ৪
[৩] বিদায়া নিহায়া ইবনে কাসির ২২৫/৩

যুদ্ধকালে। এমনিভাবে খন্দক যুদ্ধের সময়ে নির্মাণ করেছেন মসজিদুল ফাতহ।[১] আর এর সবই নির্দেশ করে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্বের প্রতি এবং মুসলমান যেখানেই অবস্থান করুক সেখানে এর প্রয়োজনীয়তার উপর। এও নির্দেশ করে যে, কোন পাড়া–মহল্লাই মসজিদ শূন্য থাকতে পারেনা।

এ উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – অপবিত্র স্থান ব্যতীত– যমীনের সব স্থানেই তাদের জন্য সালাত আদায় বৈধ করা হয়েছে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً.

'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র ও সিজদার স্থান করা হয়েছে,[২]

কেননা পূর্ববর্তী উম্মতগণ কেবল নির্দিষ্ট কিছু পবিত্র স্থানেই সালাত আদায় করতে পারত। মসজিদ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর ঘর। আল্লাহর বন্দেগিকে সমুন্নত করার স্থান। মুত্তাকিদের ইবাদতের কেন্দ্র, যেখানে মুমিনগণ প্রশিক্ষণ লাভ করে। তাইতো কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে আপন সত্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে –

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ .

'নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদ আবাদ করে.....'

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ .

'নিশ্চয় মসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্য......'

মসজিদের যদি সম্মান ও গুরুত্ব না থাকতো আল্লাহ তায়ালা মসজিদকে নিজ সত্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতেন না। সুতরাং মসজিদ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায়ের স্থান। কারো মত হচ্ছে, যে স্থানে মানুষ ইবাদাত করে সেটিই মসজিদ[৩]। আর যে বিনা কারণে মসজিদ হতে বিমুখ হয় সে নিজেকে মুনাফিক হিসাবে নাম লেখায়। শাসকের উপর দায়িত্ব হল প্রজাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তে জামাআতের সঙ্গে সালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হতে বাধ্য করা, এবং যে বিনা

[১] ওফাউল ওফা বি আখবারে দারিল মুস্তফা ১০২৮-১০২৯/৩

[২] বুখারি, ১৭২/১ মুসলিম ৩৭৮/১ তিরমিযি,১৩৪/২

[৩] ইলামুল মাসজিদ ফি আহকামিল মাসজিদ পৃ: ২৭

কারণে জামাআতে অনুপস্থিত থাকবে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব শাস্তি আরোপ করেন নি যেমন আগুনে ভস্ম করা- সে সব প্রয়োগ করবে না।

মসজিদ হচ্ছে সবচেয়ে পুণ্যময় স্থান, মুসলমান যেখানে দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে । মসজিদ হলো ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য বিদ্যাপীঠ স্বরূপ। যার সিলেবাস হচ্ছে আল–কুরআন। যাকে গণ্য করা হয় দ্বীন এবং রাষ্টের যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান হিসেবে[১]। যা ইসলামি জামাআতের অগ্রযাত্রা, তাদের ইবাদাত, শিক্ষা ও বিবিধ কর্মসূচির প্রচার কেন্দ্র। তাই সেখানে সালাত প্রতিষ্ঠা করা হয়, শিক্ষার আসর বসে, কুরআন হেফয, অনুবাদ–ব্যাখ্যা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলে। এবং এখান থেকেই জিহাদি কাফেলা যাত্রা করে, এখানে আল্লাহর শরিয়ত এবং তাঁর নবীর তরিকা মত বিচারকার্য পরিচালিত হয়। এ মসজিদ হচ্ছে জীবনের সব বিষয়ের জন্য 'বাতিঘর' স্বরূপ।

সালাতের সাথে মসজিদের সংযুক্ততার কারণে তা হয়ে উঠেছে মুসলমানদের প্রথম 'শিক্ষা কেন্দ্র' আর এ রসালাতই হল দ্বীনের বুনিয়াদ ও খুঁটি। ইসলামি জামাআত তৈরীতে মসজিদরে ভূমিকা হচ্ছে মূখ্য। রাসূল স. মদিনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। আর তা হয়ে উঠেছিল উম্মতকে শিক্ষা দানের মূল কেন্দ্র। সাহাবাগণ যেখানে তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে বসে যেতেন তাঁর মুখ:নিসৃত বাণী শ্রবণের জন্য।

সময়মত সালাত আদায়ের গুরুত্ব:

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوتاً.

'নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয'।[২] আল্লাহ সব সালাতের সময় নির্ধারন করেছেন। এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করাও ফরয করেছেন। প্রত্যক মুমিন এ- আদেশ প্রাপ্ত। । সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই

[১] মাফহুমুল মসজিদ ফিল ইসলাম, ড. আলি আল কারাত,পৃ:১০৯

[২] সূরা নিসা: ১০৩

সালাত আদায় করতে হবে। এবং এটা মুসলমানদের নিকট একটি অবিসংবাদিত বিষয়।[১]

আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম-

أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاة على وقتها.

কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন,'সময় মত সালাত আদায় করা'[২]

সময় মত সালাত আদায়ের বিষয়টি কুরআন এবং হাদীসে সালাত সংক্রান্ত সব আলোচনায় সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। যে সময় মত সালাত কায়েম করে তার অন্য সব আমলও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হয় ।

সালাতের গুরুত্ব এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান :

জেনে রাখা দরকার যে, আপনি আল্লাহর জন্য একটি সেজদা করলে আল্লাহ আপনার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, একটি গুনাহ মুছে দেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পাপগুলো ঝেড়ে–মুছে পরিস্কার করে দেয়, যেমন পানি ময়লা ধুয়ে পরিস্কার করে। বান্দা যখন সালাত আদায় করতে শুরু করে, প্রতিটি সেজদা ও রূকুতে তার গুনাহ ঝরতে থাকে। কিয়ামত দিবসে প্রথম হিসাব হবে সালাতের। যদি সালাত ঠিক হয়, তার সব আমল ঠিক বলে বিবেচিত হবে। সালাত যদি নষ্ট হয় সব আমল নষ্ট বলে গণ্য হবে। উপরে যা উল্লেখ করা হল তা মূলত হাদীসের সারসংক্ষেপ। সংক্ষিপ্ত করার অভিপ্রায়ে হাদিসগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল নফস নামক দুশমন তথা কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা। যাতে সে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে বিনয়ের স্বাদ পেতে পারে। আর এটিই হলো সৎ কর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য।

ফজর সালাত সময়মত আদায়ের উপায়সমূহ :

[১] তাইসিরুল কারিমির রাহমান, ২৯৯/১

[২] বুখারি, ৫২৭ মুসলিম, ৮৫।

১.সময়মত সালাত আদায় সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিগুলো পড়া, বিশেষভাবে ফজরের সালাত সংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলো অধ্যয়ন করা অত্যাবশক। এ বিষয়ে অনেক উদ্ধৃতি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدا

'এবং ফজরের কুরআন পাঠ, নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ উপস্থিতিপূর্ণ'[১]

এতে উদ্দেশ্য হল ফজরের সালাতে রাত–দিন উভয় সময়ের ফেরেস্তারা উপস্থিত হয়।

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِيْ الْظُلَمِ إِلى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ.

'অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদেরকে কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ নূরের'সুসংবাদ দাও।[২]

এ নূর তাদেরকে সকল দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে, এ হলো যথার্থ বিনিময়।

رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

'ফজরের দুই রাকাত সালাত দুনিয়া এবং এর মাঝে বিদ্যমান সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ'[৩]

এ যদি হয় ফজরের দু রাকআত সুন্নাতের মর্যাদা তাহলে ফরযের মর্যাদা কেমন হবে?

..سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: تَجْتَمِعُ مَلَائكَةَ الْلَيْلِ وَمَلَائِكَةُالنَّهَارِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ .....

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছি, রাতের ফেরেস্তা এবং দিনের ফেরেস্তা একত্র হয় ফজরের সালাতে'- আবু হোরায়রা রা. এ বিবরণ দেয়ার পর বললেন, ইচ্ছে হলে পড়ে দেখতে পার-

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿الإسراء:٧٨﴾

[১] সূরা ইসরা, ৭৮।

[২] আবুদাউদ, ৫৬১, তিরমিযি,২২৩।

[৩] মুসলিম, ৭২৫।

অর্থাৎ ফজরের সালাতের ক্বিরাত তা উপস্থিতিপূর্ণ। ফেরেস্তারা এ সালাতে উপস্থিত হন। একত্র হন এতে রাত ও দিনের ফেরেস্তারা। ক্বিরাত এবং সময়ের মর্যাদার জন্য রাসূল স. ফজরের সালাতে ক্বিরাত দীর্ঘ করতেন।
ফজরের সালাতকে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করেছেন এর প্রতি অতিরিক্ত যত্ন এবং একে বিশেষভাবে স্মরণের জন্য–

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴿١١٤﴾

'আর দিনের দুই প্রান্তে সালাত কায়েম কর এবং রাতের প্রান্তভাগে। অবশ্যই পুণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়.....'[১]।
তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন:
আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন: এর দ্বারা ফজর এবং মাগরিব উদ্দেশ্য, মুজাহিদ রহ. বলেন: ফজর, যোহর ও আসর।
এছাড়াও অন্যান্য মনীষীগণ ফজর ও আসর বলে নিজেদের মত উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাখ্যা প্রতিভাত হচ্ছে যে, ফজরের সালাতের ফযিলত অনেক, এ সালাত গুনাহ মোচনকারী এবং মন্দ বিদূরিতকারী বলা হয়েছে।
উপরোক্ত কয়েকটি বাক্যে ফজরের সালাতের ফযিলতের বর্ণনা হয়েছে। মুমিন ও আল্লাহ ভীরুদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টির জন এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট।
উসমান ইবনে আফ্ফান রা. বলেন:আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি:

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

যে ব্যক্তি এশার সালাত জামাআতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করল। আর যে ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত ইবাদতে অতিবাহিত করল।[২]

[১] সূরা হুদ, ১১৪।
[২] মুসলিম, ৪৫৪।

মুসলমানের উচিত বারবার এসব ফযিলত পড়ার অভ্যাস করা। যাতে তার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, এবং তার সংকল্প সুদৃঢ় হয়। কারণ উপদেশ স্মরণ এবং বারংবার পঠন মুমেনদের জন্য উপকারী।
এসব কারণে মুমিনগণ ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়া এবং অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণাকে পরাভূত করতে পারে।
তাই নেক আমলে আগ্রহী ও অবিচল সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশের আগে প্রথম আযান শরিয়ত অনুমোদন করেছে'। আবার আযানের মধ্যে এমন বিশেষ বাক্যগুচ্ছ রাখা হয়েছে যা বিদ্যুৎ গতিতে মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং তাড়িয়ে দেয় তার ঘুম। الصلاة خير من النوم ধ্বনি তাকে অনুপ্রাণিত করে আল্লাহর পানে ধাবিত হতে। জেনে রাখ, সালাতের স্বাদ উত্তম, ঘুমের স্বাদ থেকে। যে আযান শুনল এবং তার হৃদয়ে তা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারল না সে দুনিয়ার স্বাদকে আখেরাতের নিয়ামতের উপর প্রাধান্য দিল। তাকে এ মর্মে শাস্তি দেয়া হবে। শয়তান তার উভয় কানে পেশাব করবে। তার সকাল হবে দুষ্ট আত্মা নিয়ে আর সে থাকবে গাফেল ।
২. আত্মার ব্যধিসমূহ অনুসন্ধান , নির্ণয় করা এবং ঔষধ সেবনের মাধ্যমে তা নিরাময়ের চেষ্টা করা। কারণ আত্মা হচ্ছে অধিনায়ক। সে যদি ঠিক থাকে তাহলে তার বাহিনী তথা অঙ্গ-প্রতঙ্গও ঠিক থাকবে। আর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকবে। নবী স. ইরশাদ করেন,'বান্দার ঈমান সঠিক হয় না যতক্ষণ না তার আত্মা সঠিক হয়। আর এটা জানা কথা যে, ঈমানের বৃক্ষ অন্তরে- কুরআন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে, সেচ হল আল্লাহর যিকর, কাণ্ডে দাঁড়ানো হল আল্লাহর সীমানা হেফাযত এবং আল্লাহর আদেশ–নিষেধকে সম্মান দেখান।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴿٢٨﴾

'যারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে'[১]
৩. এশা, তার পরের সুন্নাত ও বিতির সালাত পড়ে রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং রাত জেগে গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু

[১] রায়াদ, ২৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশা'র সালাত আদায়ের আগে ঘুমানো এবং এশার পর গল্প-গুজব করা অপছন্দ করতেন।
তবে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, মেহমানের সঙ্গে আলাপ করা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্প করা যাবে, যদি তাকে ঘুম থেকে ডেকে উঠানোর লোক থাকে। অথবা তার অভ্যাস আছে যে সে জাগ্রত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি প্রবল ধারণা হয় যে সালাতের ক্ষতি হবে তাহলে রাত জেগে গল্পে লিপ্ত হবে না। এবং অধিক রাত জাগ্রত থেকে ক্বিয়ামুল লাইল তথা নফল এবাদতও করবে না যদি তার ফজর সালাতের উপস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটে। এ জন্য হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ হয়েছে-

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ .

'যে সব আমল দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে যা আমি তার উপর ফরজ করেছি।'[১]
এক দীর্ঘ ঘটনায় হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়ালাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হাতামা গোত্রের উম্মে সোলাইমান শিফা এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজকের ফজরে সোলাইমানকে দেখলাম না যে?, তিনি উত্তরে বললেন, সে রাত্রে জাগ্রত থেকে এবাদত করায় ঘুম থেকে উঠতে পারেনি। উমর রা. বললেন,

لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.

আমি ফজরের জামাআতে উপস্থিত হতে পারাকে পুরো একরাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করা থেকে অধিক প্রিয় মনে করি।[২]
এশার পর মধ্যরাত পর্যন্ত যারা মাইক্রোফোনে ওয়াজ–নসীহত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন!! আপনাদের মাঝে যদি বর্ণিত বৈশিষ্টাবলী বিদ্যমান থাকে তাহলে তো ভাল। আর যদি না থাকে তাহলে?... এটি কোন ক্রমেই সঙ্গত হবে না।
শা'বী রহ. বলতেন, যার ফজরের দুই রাকাত ছুটে গেল তাকে যেন জ্বিন–ইনসান অভিশাপ দেয়।

১
২

এ উক্তির উপর নির্ভর করে বলা যায়, যে ব্যক্তি অধিক রাত্রি জাগ্রত থাকল এবং অনীহা–অনাগ্রহের সাথে ফজর আদায় করল সে ঐ মুনাফিকের ন্যায় হল, যে কেবল অলস অবস্থায়ই সালাতে আসে'। তোমরা ঐ সব মেহমানকে স্বগাতম জানানো পরিহার কর, যারা ফজরের সালাত মাটি করে দিতে পরওয়া করে না; রাত জাগা এবং গল্পে লিপ্ত থাকাই যাদের কাছে প্রিয়।
৪. আধুনিক কোনো যন্ত্র সংগ্রহ করবে যা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলে। যেমন-এ্যালার্ম ঘড়ি, মোবাইল এ্যালার্ম।অথবা প্রতিবেশীদেরকে বলবে নেক কাজে সহযোগিতা স্বরূপ একে অপরকে জাগিয়ে দিতে। এতে তার হৃদয়ও ঝুঁকে থাকবে আল্লাহর প্রতি।
৫. ঘুমের আদব এবং দু'আ-আযকার আদায়ে যত্নবান হবে। বিশেষতঃ ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস ,সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করে পবিত্র আবস্থায় ঘুমান। (আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন) একটি কথা স্মরণ রাখবেন। বান্দার সামর্থ্যে যা আছে তা যদি সে ঠিকমত পালন করে,তাহলে যে বিষয়ে সে সামর্থ্য রাখে না আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন। সুতরাং সে যদি শরীয়ত নির্ধরিত নিয়ম পালন করে ঘুমাতে যায় তাহলে ফজর সালাতে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।
৬. নিয়মিত এক মসজিদে ফজরের সালাতে উপস্থিত হওয়া। যেন সে সালাতে না এলে তার অন্যান্য দ্বীনী ভাইয়েরা তার অনুপস্থিতি টের পায়। সুতরাং সে যদি অবহেলা করে সালাতে না যেয়ে থাকে তাহলে তারা তাকে উপদেশ দিবে এবং আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করবে। কারণ শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে তুল্য আর নেকড়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলই শিকার করে।
বিশিষ্ট তাফসীরবিদ মুজাহিদ রহ. বলেন, যদি কোন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাই থেকে কোন ভাবে উপকৃত নাও হয়, তবে তার প্রতি লজ্জাবোধ থাকায় সেটি তাকে গুনাহ হতে বিরত রাখে। তাহলে এতটুকুই তার জন্য যথেষ্ট।
৭. আল্লাহর রাসূলের নিম্নোক্ত বাণী পালন করার চেষ্টা করবে নিরন্তর ভাবে, নবীজী বলেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চলিশ দিন পর্যন্ত তাকবীরে উলাসহ জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার পুরস্কার স্বরূপ দুইটি মুক্তি ঘোষনা করেছেন। একটি জাহান্নামের আগুন থেকে অপরটি নিফাক থেকে।

বরং মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন তাকবীরে উলাসহ সালাত আদায় করার দৃঢ় সঙ্কল্প করবে। মুমিনের নিয়ত আমলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং এসব বিষয়ে সালফে সালেহীনদের জীবনী পাঠ করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে।

ফজর সালাতের ফযিলত:

জারির বিন আব্দুলাহ হতে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন করে তোমরা চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাকে দেখায় তোমাদের কোন কষ্ট হবেনা। যদি তোমরা সূর্য উদয় ও অস্তের পূর্বে সালাত আদায় করতে সক্ষম হও তাহলে তা–ই কর ।[১]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴿طه:١٣٠﴾

'এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে'[২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: আল্লাহর দিদার উল্লেখ করার সময় এ দুই সালাত উল্লেখ করার মাঝে সম্পর্ক হল– সালাত শ্রেষ্ঠ বন্দেগি আর অন্য সালাতের উপর এ দুই সালাতের ফযিলত প্রমাণিত হয়েছে এভাবে যে এ দুই সালাতের সময় ফেরেস্তাগণ একত্রিত হন এবং আমল আল্লাহর কাছে উঠানো হয়। সুতরাং এ দুই সালাতের সংরক্ষণকারীকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহর দিদার।[৩]

সালাত এবং আমাদের শিশু :

হে মুসলিম ভাই, আপনার সামনে সালাত সম্পর্কীয় কতিপয় শিক্ষণীয় সতর্কবাণী পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি যা আপনার সন্তানের জন্য অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

[১] বুখারি।
[২] সূরা ত্বাহা, ১৩০।
[৩] ফাতহুল বারী ৪৪/২

১. শিশুরা ধারণা করে বড়রা যা করে সবই ঠিক। তাদের পিতারাই হল পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। তাই তাদের উপরই বিশ্বাস রাখে, সব ক্ষেত্রে তাদেরকেই অনুকরণ করতে চায়। তারা ঐ বয়সে আদেশ–উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়না, যদি না তার সামনে বাস্তবে অনুকরণ যোগ্য কোন আদর্শ থাকে। সে বিবেচনায় সালাতের প্রতি পিতার নিয়মানুবর্তিতা তাদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে নি:সন্দেহে।

২. পিতার উচিত এ জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা, যেমন করেছিলেন নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -'হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে গ্রহন কর'।

৩. পিতার জানা থাকা উচিত যে, শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি প্রদান হচ্ছে (শর্তের অনুবর্তিতায় হলেও) সর্বশেষ মাধ্যম, এতে যেন শিশু অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ফলে এর প্রয়োগ যত কম করা যায় ততই ভাল; তাহলে এর পর আর কোন হাতিয়ার থাকবে না।

৪. পিতার উচিত নিজের সন্তানকে ওযু-পবিত্রতা অর্জনসহ প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তার মত করে বুঝিয়ে দেয় অত:পর হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া, এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং তাকে নিজে করে দেখানোর সুযোগ দেয়া। এরপর দেখাতে গিয়ে যদি সে ভুল করে তাকে আবারও শিক্ষা দিবে, দিক নির্দেশনা দিবে সস্নেহ ও কোমলভাবে। কোন ভাবেই কঠিন ও রূঢ়ভাব দেখানো ঠিক হবে না। যদি সে সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে ওজু করে দেখাতে পারে তবে উৎসাহ প্রদান মূলক তার প্রশংসা করবে, আদর করে চুমো দিবে।

৫.সন্তানদেরকে ওজুর ফযিলত শিক্ষা দিবে যেন সে নেকি অর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়।

৬. শিশু বয়সেই সালাত বিষয়ক শিক্ষা সম্পন্ন করতে হবে তবে সরাসরি আদেশ দিয়ে নয়। বরং ঘরে তার সামনে বারবার নফল আদায় করার মাধ্যমে। এটা তাদের কচি মনে প্রভাব ফেলবে গভীর ভাবে- যখন সে দেখবে, তার পিতা আল্লাহর জন্য সেজদার মাধ্যমে বিনম্র ভাবে আপন চেহারা ধূলোয় মলিন করছে। সালাত তাকে তার পরিপার্শ্ব থেকে একেবারে পৃথক করে দিয়েছে । এতে শিশুদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের বীজ বোপিত হবে।

৭. সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে পিতা তাকে সালাত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন পবিত্রতা অর্জন, সতর ঢাকা ইত্যাদি বিষয়ে কড়াকড়ি করবে না বরং তাকে তার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে যতটুকু হোক ,যে ভাবে হোক তাকে দিয়ে করাবে এবং তার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করবে, কোন বিষয়েই

তাকে বাধ্য করবে না। কারণ এতে করে সালাতের প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে –সালাতের বয়স হলে– সালাত থেকে দূরে সরে যাবে এবং অপছন্দ ও কষ্টকর মনে করবে।

৮. সন্তান সপ্তম বছরে পদার্পণ করলে পিতা তাকে সালাতের আদেশ করবে। নবী স. ইরশাদ করেন,

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين.

'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর পূর্ণ হলে তাদের সালাতের আদেশ দাও'।[1] এবং তাকে সালাতের শর্তাদি, পবিত্রতা, সতর ঢাকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে আদেশ কর ।

৯. সপ্তম বছরে পদার্পণ পূর্ব পর্যন্ত দিনগুলো কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান , শিক্ষাদান ব্যতীত শুধুমাত্র এমনি এমনি পার হয়ে যাবে এমনটি করা ঠিক হবে না। বরং পূর্ব হতেই তাকে সালাতের মত আবশ্যিক একটি মহান কাজ তার সামনে আসছে মর্মে অবগত ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। এরপর যখন সাত বছরে পৌঁছবে এবং প্রথম ফরয আদায় করার সময় আসবে। পিতা তার বন্ধু-বান্ধব ও নিকট আত্মীয়–পরিজনদের একত্র করে এ উপলক্ষে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। এ উপলক্ষে তাকে ছোটখাট একটি উপহার যেমন হাত ঘড়ি বা এ জাতীয় কিছু উপহার দিয়ে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পারে। যেন সে সময়মত সালাত আদায়ে উৎসাহ অনুভব করে।এবং এর প্রতি অধিক যত্নবান থাকে।

১০. সালাতের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ, উপদেশ প্রদান এবং বিরক্তির উদ্রেক না করে এমন ভাবে বার বার উৎসাহ প্রদান–নির্দেশদান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সযত্ন পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখা জরুরী। পিতার ব্যস্ততা বা অনুপস্থিতিতে অপরকে তার তদারকির দায়িত্ব দিবে।

আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ বলেন:

حَافِظُوْا على أَبْنَائكم في الصلاةِ ، وَ عوِّدواهم الخيرَ فإن الخيرَ عَادةٌ.

[1] আবুদাউদ

'তোমাদের সন্তানদের সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, এবং তাদেরকে নেক কাজে অভ্যস্ত কর কারণ নেক কাজ অভ্যাসের ফলে হয়'।[1]

১১. সালাতে নিয়মিত ও যত্নবান হওয়ায় মাঝে মধ্যে পুরস্কৃত করা দোষনীয় নয়; তবে সব সময় এমনটি করবে না। হাদিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারের হাদিয়া ভিন্ন হওয়া ভাল।

১২. সন্তানদের পছন্দনীয় ও প্রিয় কাজগুলোকে সালাতের সাথে জড়িয়ে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ আসর বা মাগরিবের সালাত আদায়ের সাথে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া। যেমন বলল যে আসরের পর আজ আমরা অমুক জায়গায় ঘুরতে যাব।এতে করে তারা পুলকিত হবে এবং সময়মত সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে।

১৩. এমনিভাবে সন্তানদের সাথে সকল প্রকার প্রোগ্রাম সেট করবে সালাতের সময়ের সাথে মিল করে। এতে করে সালাতের সময়ের সাথে মিল করে তারা সময় বিন্যাস শিখবে।

১৪. মাঝে মধ্যে সময় সুযোগ করে তাদেরকে কুরআন হাদীসে বর্ণিত সালাতের ফযিলতগুলো স্মরণ করিয়ে দিবে। এতে করে সালাত এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও ধ্যান–ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

১৫. ফরয সালাতের সাথে সাথে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলোও আদায়ের অভ্যাস করিয়ে নিবে। বিশেষত: দশ বছর পর থেকে। পাশাপাশি ক্বিয়ামুল লাইলের প্রতিও তাদেরকে উৎসাহ দিবে; রাতের সামান্য কিছু অংশ হলেও। পিতা সন্তানদের মাঝে ঘোষণা করবে যে, তিনি আজ অমুক সময় তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য জাগ্রত হবেন, ওই সময় (নিজ আগ্রহে)কে কে উঠতে পারে এ প্রতিযোগিতায় তাদের ছেড়ে দিবেন। তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করার জন্য পিতা নিজে তাদের জাগ্রত করবেন না। সালাতের ব্যাপারে তাদের উপর সহজ করবেন। তাদের মাঝে কারো তন্দ্রা এসে গেলে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাকে ঘুমাতে বলবেন।

১৬. দশ বছরের পর সন্তান যদি সালাতে ত্রুটি ও অবহেলা করে পিতার কর্তব্য তাকে উপদেশ দেওয়া এবং সালাত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বর্ণনাগুলো স্মরণ করানো। এরপরও যদি অবহেলা অব্যাহত থাকে তার প্রতি কঠোরতা

[1] তাবরানি : মুজামুল কাবির

করবেন। তার সাথে মেলামেশা করবেন না। তাদেও সাথে খোশগল্প করবেন না। অভিমান করে কথা বলবেন না। তার প্রিয় বস্তু হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। যদি মানসিক শাস্তির এ প্রক্রিয়া কাজে না আসে। তাহলে নির্ধারিত শর্তাদি মেনে নিয়ে শারীরিক শাস্তির শরণাপন্ন হবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'সালাত না পড়ার জন্য তাদের প্রহার কর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়'।

১৭. শিশুকে ছোট বয়সেই জামাআতে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত করবেন। যাতে তার মন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এখানে তারা আলেমদের থেকে জানতে পারবে এবং শিক্ষার আসরে বসার আদবসমূহ হাতে কলমে শিক্ষা ও চর্চা করতে পারবে।

১৮. মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আগেই তাকে মানসিকভাবে এর জন্য তৈরি করে নিবেন। তার কাছে মসজিদের গুণাবলী বর্ণনা করবেন। যাতে সে কোন আকস্মিকতার মখোমুখি না হয়। এবং তার সামনে মসজিদ নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করবেন। মসজিদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে বলবেন এ দেখ, কি সুন্দর বিল্ডিং, এটা হল মসজিদ। আমি তোমাকে অচিরেই আমার সাথে মসজিদে নিয়ে যাব, তুমি তাতে সালাত আদায় করবে।

১৯. তাকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে মসজিদের পরিবেশও তৈরি করে নিবেন। ইমাম, মুয়াযি্যন, প্রতিবেশী মুসলী এবং তাদের ছেলেদের সাথে কথা বলে নিবেন। তারা যেন তার সাথে মিশে, তাকে আদর করে, সুন্দর করে কথা বলে। এতে করে সে ঘনিষ্ঠতাবোধ করবে,আড়ষ্টতা কেটে যাবে। ফলে আহলে মসজিদের প্রতি তার আস্থা ও সম্মান তৈরী হবে। পরিণতিতে তার মনে সালাতের মর্যাদা জন্মাবে, সালাত আদায়ে আগ্রহ বোধ করবে।

২০. মসজিদের ইমামের সহায়তায় তাকে কুরআন হেফয ও শুদ্ধকরনের লক্ষ্যে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা মক্তবের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া।

২১. মসজিদের সাথে তার সম্পৃক্তাকে দৃঢ়করণে গুরুত্ব দিতে হবে বাচ্চাদের উপকারী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও অনুষ্ঠানাদির আয়োজনের মাধ্যমে।

২২. জুমআর রসালাতকে তার সামনে বড় করে উপস্থাপন করা। এর আহকাম, আদব এবং একে সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা দেয়া।

২৩. পিতা খতীব নির্বাচনের ব্যাপারটিও মাথায় রাখবেন। কারণ তাঁর খোৎবা এবং তাঁর মতাদর্শের একটা গভীর প্রভাব পড়ে সন্তানের চরিত্রে। বিশেষত: যদি

সে খুৎবার ভাষা বুঝে। খুৎবার পর তাদেরকে খুৎবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে সন্তানকে নীরবতা পালনের ব্যাপারে বুঝাবে এবং আগেই বলে দিবে যে, সালাতের পর খুৎবার মূল বক্তব্য কি সে বিষয়ে আমাকে বলতে হবে।

এ ছিল সুসন্তান গঠনে কতিপয় উপকারী নির্দেশিকা ও আদব। যে ব্যাপারে প্রত্যেক পিতাকেই গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত এবং আদর্শ জাতি ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনকল্পে উক্ত নির্দেশিকা সন্তানদের মাঝে প্রতিফলিত করার ব্যাপারে উদ্যোগি হওয়া সময়ের দাবি। আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনে আমাদেরকেই ভূমিকা নিতে হবে সামনে থেকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

উপসংহার:

সম্ভবত এ আলোচনা থেকে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিষয় অনুভব করতে পেরেছি। ফিকহি আলোচনা উদ্দেশ্য ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে এমন কিছু প্রকাশ্য ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা।

এসব মাসায়িল শুধু ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে তা হবে বড় বিপদ। এসব কিছুর পরও কেউ কেউ বলবে, জামাআত হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অথবা ফরযে কিফায়াহ। তখন সে ঘরে সালাত আদায় করাকে পাপ বলে মনে করবেনা, আর জামাআতে অংশ গ্রহণ না করা যে মুনাফিকির নিদর্শন সে দিকে দৃষ্টিই দিবে না।

ইমাম, খতীব ও জ্ঞানী আলেম ওলামাদের অবশ্যই কর্তব্য এমন জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে খুৎবা ও ওয়াজের বিষয়বস্তু বানানো। তা না হলে তারাও ভুল বুঝাবুঝি ও খারাবি বৃদ্ধির দায় এড়াতে পারবেন না।

কারণ মানুষ এসব মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানার জন্য তাদের দারস্থ হয় –যা ছিল তাদের [ওলামাদের] প্রধান দায়িত্ব– আর তারা এসব বুনিয়াদি বিষয়বস্তুকে পাশ কাটিয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি এমন সব কিচ্ছা কাহিনীর দিকে ফিরিয়ে দিলেন, সমস্যার সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। ফলে ভুল ভুলই থেকে গেল। যা শোনানো হল এবং যা শুনল কোনই কাজে আসল না। অনুরূপ ভাবে

মসজিদগুলোতে ফজরের পর দ্বীনী তা'লীমের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অতীব জরুরী। আর ঈমানদার নির্ণয়ের বড় মাপকাঠি হওয়া উচিত ফজরে মসজিদে উপস্থিত হওয়া।

সুন্দর সুন্দর কথা, হাসিখুশি চেহারা, অধিক গল্পে মেলামেশা সততা ও ঈমানের নিদর্শন নয়। অনেক খতীব আছেন –ভাষাবিদ, বাগ্মী, কথার জাদুকর– কিন্তু সূর্য কিরণ ছড়ানোর পূর্বমুহূর্তে কোন যুবক বা কিশোরকে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সত্য উচ্চারণ করা ও পরস্পর একে অপরের হিতাকাঙ্খী হওয়া; সঙ্গি–সাথি, বন্ধু–বান্ধব, শিক্ষক ও মুরব্বিদের সাথে মোসাহেবি নয়। এতে উম্মতের কল্যাণ চলে যায়।

অনেক গুনাহের কাজ ছোট আকারে শুরু হয়। সে সম্পর্কে মানুষ নীরব থাকে,বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয় না। পরে এক সময় এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। যেখানে আর ব্যক্তিগতভাবে আদেশ নিষেধ কঠিন হয়ে পড়ে।

সুতরাং বর্তমানে যে বে পর্দা, মদের আসর, নাচ–গানের আসর, ধূমপান, দাড়ি কামানো, সালাতে অবহেলা, সুদ খাওয়া, কাজ কারবারে ঘুষের বিস্তৃতি ইত্যাদি। এসব এত ব্যাপক হয়েছে শুরুতে সংশোধনের প্রতি উদাসীনতা–অবহেলার কারণে।

হে আল্লাহর বান্দা! সালাতে একাগ্রতা এবং বিনম্রতার গুরুত্ব ভুলে যাবেন না। কারণ সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর বড় উদ্দেশ্যই হল একাগ্রতা ও বিনম্রতা।

আপনার হৃদয়ে যে পরিমাণ একাগ্রতা, বিনম্রতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সালাত আদায়ে অনুসরণ হবে রাসূল স. এর সালাতের, ঠিক সে অনুপাতেই আপনি এর প্রতিদান পাবেন।এর প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয় সালাত অশীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে'।[১]

এমন অনেক আসবাব–উপকরণ রয়েছে , যার কারণে অনেক জাতি গোষ্ঠী বিলীন হয়ে গিয়েছে বা ধ্বংসের দারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে । সে সব কার্যকারণ অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য থাকায় সমাজ বিজ্ঞানীরা তা উদ্ঘাটন করতে পারেনি বা বিলম্বে

[১] আনকাবুত : ৪৫

উদ্ঘাটিত হয়েছে।কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েই গিয়েছে। আমি এ পুস্তিকাতে সে সব কার্যকারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাই। তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আমার গোনাহ মাফ এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে কবুল করেন। প্রত্যেক মুসলিম পাঠকের কাছে সংকলকের পক্ষ থেকে বিনীত প্রত্যাশা তারা যেন তার জন্য ক্ষমা এবং খাতিমা বিল খাইরের দু'আ করেন।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاأنت أستغفرك وأتوب إليك.

সমাপ্ত